রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

ইতিহাসের গল্প

(প্রথম ভাগ)

প্রথম সংস্করণ

মার্চ—১৯৪৫

প্রকাশক : রাধিকা প্রসাদ সোম, পূরবী পাবলিশার্স,
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

মুদ্রাকর : কিশোরীমোহন নন্দী, গুপ্তপ্রেশ,
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

দাম : পাঁচ সিকা

স্বীকৃতি

পৃথিবীর ইতিহাস লেখা আমার পক্ষে খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। তবু ছোটদের তরফ থেকে এর বিশেষ তাগিদ ছিল বলেই সাহস করে এগিয়েছি। রচনার মধ্যে নিজস্বতার দাবী নেই মোটেই। তাতে যদি কোন ভুলচুক কারও চোখে পড়ে ধরিয়ে দিলে বাধিত হব।

সমাজতাত্ত্বিক দর্শনে ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (দাম ২৷৷০) হচ্ছে প্রামাণ্য পুঁথি। তাঁরই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রথম ভাগের 'প্রথম খণ্ড' দাঁড় করিয়েছি। বাকী সমস্ত বইটিতে যথেচ্ছ সাহায্য নিয়েছি হেণ্ডরিক ভ্যান লুন-এর 'History of Mankind'; জওহরলালের 'Glimpses of World History'; রাহুল সংকৃত্যায়নের 'মানব সমাজ' ও আরও নানা বই-এর। ভারতের অধ্যায়ে এসে বিপদ হয়েছিল।

আমাদের অতীতের ইতিহাসে নানা জট পাকানো আছে। এখন পর্য্যন্ত প্রামাণ্য মত হচ্ছে যে ভারতে আর্য্যদের আগেও এক ভিন্ন সভ্যতা ছিল—যার প্রমাণ মহেন-জো দাড়ো! আধুনিক ভারততত্ত্বের দিক থেকে এর প্রতিবাদ উঠ্‌ছে। ডাক্তার ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, পি-এইচ ডি, প্রধানতঃ নব মতের পৃষ্ঠপোষক। মহেন-জো দাড়ো এবং বেদের সভ্যতা একই স্তরের বলে তাঁর ধারণা! স্বামী শঙ্করানন্দ তাঁর 'Rigvedic Culture of the pre-historic Indus-এও ঐ কথাই বলেছেন।

আমাদের দেশের কিশোরদের সেই অতীত ঐতিহ্যের কথা জানা প্রয়োজন বলে নতুন মতই দিয়েছি। স্থানাভাবের দরুণ দেশবিদেশের সমস্ত যুগের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় নি।

বইটি পড়ে যদি কিশোররা বুঝতে শেখে যে ভারতের ইতিহাস পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ও পৃথিবীর ইতিহাস নিত্য নতুন ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে রচিত হ'চ্ছে—এতে শাশ্বতের স্থান নেই, তা হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে মনে করি।

—লেখক

কল্যাণীকে-

সূচীপত্র

,থম খণ্ড

তীয় খণ্ড

সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির মুখপত্র "ইণ্ডো-সোভিয়েট জার্নাল" ও সাপ্তাহিক "জনযুদ্ধ" তাঁদের ব্লক ব্যবহার করতে দিয়ে আমায় বাধিত করেছেন।
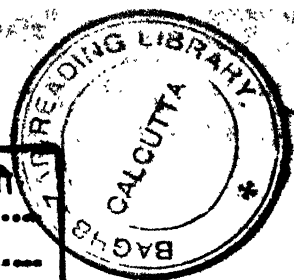
ইতিহাসের গল্প

(প্রথম খণ্ড)

গোড়ার কথা

আমরা কে, কোত্থেকে এসেছি—এগুলো সবই তোমাদের কাছে এক একটা বিরাট ধাঁধা—তাই না ?

আমরা কে ?

কোত্থেকে এসেছি ?

আর যাবই বা কোথায় ?

যুগ যুগান্ত ধরে নানা পণ্ডিত নানা ভাবে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তবু আমাদের কাছে এসব কথা এখনো সহজ হয় নি।

এঁদের গবেষণার ফলে আজ আমরা নিজেদের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই ঠিক ঠিক জানি। আর যা এখনো জানি না তা আন্দাজ করে নিতে পারি। তাতে খুব ভুল হয় না।

এ অধ্যায়ে তোমরা পাবে কি করে মানুষ জন্ম নিল তারই গোড়ার কথা।

পৃথিবীর বুকে জীবজন্তু বা প্রাণী যতদিন ধরে সৃষ্টি হয়েছে সেই তুলনায় পৃথিবীতে মানুষ জন্মেছে বহু বহু যুগ পরে।

জানো কি যে, এই পৃথিবীর বুকে মানুষই জন্মেছে সবার শেষে অথচ বুদ্ধি খাটাতে শিখেছে কিন্তু সেই সবার আগে। বুদ্ধির জোরেই সে প্রকৃতি-দেবীর নানা বাধা বিপত্তি জয় করে নিত্য নতুন গৌরব আজ অর্জন করছে।

প্রাণী জগতের তুলনায় মানুষের বয়স

বিজ্ঞানীরা বলেন যে সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী ছিল শুধু এক বিরাট জ্বলন্ত গোলার মত। আকাশের বিশাল শূণ্যতার মধ্যে পৃথিবী ছিল যেন ছোট্ট একটা ধোঁয়ার গোলা। কোটি কোটি বছর ধরে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে যাবার পর পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয় ছোট ছোট পাহাড়। এই সব পাহাড়ের উপর তখন অশ্রান্ত বৃষ্টি হতে থাকে। ভীষণ মুষলধারে বৃষ্টি। সে বৃষ্টিতে পাহাড়ের গায়ের ধূলো বালি মাটি কাদা নীচের উপত্যকায় গড়িয়ে চুইয়ে পড়ে। তারও শত-সহস্র যুগ পরে সেই পৃথিবীর বুকে জীবন্ত কোষ (Cell) সৃষ্টি হয়ে ছিল। কত লক্ষ বছর ধরে যে সেই জীবন্ত কোষ মহাসমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়িয়েছে তার লেখাজোখা নেই। সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষটির শত্রু ছিল আবার চারিদিকেই! লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাই সেও নানা চেষ্টা করেছে—কি করে সহজে শত্রুর হাত থেকে বাচতে পারে। কতগুলো বীজাণু নদ, নদী, হ্রদের তলায়, গভীর অন্ধকারে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। পাহাড় ধুয়ে বৃষ্টির জলের সঙ্গে যে ধূলো কাদা নদ-নদীর নীচে জমা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে তারা ক্রমে ক্রমে চারা গাছের আকার নিল।

নানা অবস্থা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে আর এক দলের দেখা গেল আঁকা বাঁকা শুঁড় গজিয়েছে। বিছের মত শুঁড়ওয়ালা সেই সব জেলি মাছের মত জীবরা সমুদ্রের নীচে চলাফেরা করত। আর একদল জলের উপর দিয়ে সাঁতরাবার চেষ্টা করতে করতে ক্রমে আঁশওয়ালা মাছে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে আগের গাছপালারও বংশ বাড়ছিল। খালি জলের নীচে থাকলে তাদের চলছিল না। তারাও জলের নীচ থেকে আস্তে আস্তে জলা জায়গা, খালবিলের ধারে আস্তানা গাড়ল। প্রথম প্রথম তাদের খুবই কষ্ট হ'ত — কারণ রোজ দু'বেলা সমুদ্রের লোণা জল তাদের ধুইয়ে দিত। কিন্তু দিন তো আর বসে থাকে না। তাই তারাও নানা ফন্দী এঁটে সমুদ্রের লোণা জলের হাত থেকে বাঁচতে শিখল। হাজার হাজার বছর কষ্ট

হাজারো রূপান্তরের ভিতর দিয়ে তার জন্ম

করার পরে সব গাছ পালার ভিতর নতুন জীবন দেখা দিল। তখন কতক গাছ বড় হল, কতগুলো আবার ছোটই থেকে গেল। তাদের নানা রংবেরং-এর পাতা গজাল। ক্রমে ফুলও ধরল সেই সব গাছে।

ফুলের মধু খেতে তখন মধুমক্ষিকার কি মারামারি। সারাদিন খালি গুন্‌গুন্ আওয়াজ। পাখীরা বা পেছনে পড়ে থাকবে কেন? তারাও ফল খাবার জন্যে গাছে এসে আড্ডা জমাল। পাখীরা আবার সেই সব ফলের বীজ দেশ-দেশান্তরে দিল ছড়িয়ে। দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবীটাই গেল বনেজঙ্গলে ভরে। ভীষণ গহন অরণ্য! সেখানে সূর্য্যের কিরণ ঢোকে না।

গাছ গাছড়ার মত এক শ্রেণীর মাছও ডাঙায় উঠে এল। তারা মাটিতে এসে ফুলফুস আর কানকো দিয়ে নিশ্বাস নিতে শুরু করল। এদের মত যেসব জীব জলেও থাকে আর স্থলেও থাকে তাদের আমরা বলি 'উভচর'। এই সব উভচরের কি আরাম! ইচ্ছে করলেই তারা জলে লাফিয়ে পড়ল, আবার ভাল না লাগলেই উঠে এল ডাঙায়!

ডাঙায় উঠে এরা ক্রমে ক্রমে ডাঙার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করল। অনেকে টিকটিকি গিরগিটির মত সরীসৃপে পরিণত হল।
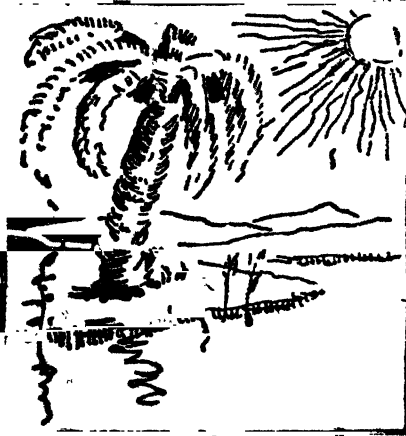
গাছগুলো উঠে এল ডাঙায়

সরীসৃপের দলও গিয়ে সেই জঙ্গলে ঢুকল! আরও তাড়াতাড়ি চলার জন্যে তারা পা আর শরীর ক্রমাগতই বদলাচ্ছিল। ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে দেখা দিল বিরাট অতিকায় জীবজন্তু। প্রাণীবিদ্যায় এঁদের নাম হল 'ইকথাইওসোরাস" (Ichthyosaurus), "মেগো-লোথোরাস" (Megalothaurus), ব্রন্টোসোরাস (Brontosaurus)।

সরীসৃপের ভিতরকার একদল আবার গাছের ডগায় উঠে থাকতে আরম্ভ করল। তখনকার গাছ ছিল অনেক উঁচু। যারা গাছের ডগায় থাকতে লাগল তাদের কাছে পা-এর দরকার গেল কমে। তারা চাইল আরও তাড়াতাড়ি এক গাছ থেকে আর এক গাছে কিংবা এক ডাল থেকে আর এক ডালে যেতে। কাজেই তাদের শরীর থেকে ছাতার মত একটা জিনিস দুদিকে ছড়িয়ে তারা লাফালাফি করতে লাগল। কালক্রমে সেই ছাতার মত জিনিসটিতে পালক গজিয়ে এই সব জীবকে বানিয়ে দিল নিখুঁত পাখী। তারা তখন হাওয়ার মধ্যে দিয়ে মনের আনন্দে এক গাছ থেকে আর এক গাছে চলে যেতে পারল।

কিন্তু এর পরেই দেখা দিল এক ভীষণ বিপদ। পৃথিবীর বুকের আবহাওয়া গেল বদলে। সে আবহাওয়ায় বিরাটকায় জীবজন্তুরা টিকে থাকতে পারল না। তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। একেবারে আলাদা জীব এসে দখল করে বসল পৃথিবীকে। এরা সব সরীসৃপদেরই বংশধর। কিন্তু তাহলেও সরীসৃপদের সঙ্গে এদের পার্থক্যও কম নয়। এদের বাচ্চারা দুধ খায়। তাই এদের 'স্তন্যপায়ী' বলা হয়। মাছের গায়ের মত আঁশও তাদের ছিল না, আবার পাখীর মত পালকও ছিল না তাদের গায়ে। সমস্ত শরীর ছিল ঘন লোমে ঢাকা। এই সব স্তন্যপায়ীদের ভিতর একদল খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল। অনেক চেষ্টার পর তারা আর সকলের চেয়ে ভাল খাবার আর আশ্রয় জোগাড় করে নিয়েছিল। এমন কি সামনের পা দিয়ে এরা শিকারও ধরতে পারত। অনেক সাধ্য সাধনার পর এরা হাতটাকে খাবার মত করে নেয়। অবশেষে আরও লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টার পরে এরা শিখেছিল দু-পায়ে দাঁড়াতে।

এরা না হল বানর, না বনমানুষ। তাহলে কি হবে, শিকারে এদের সমকক্ষ ছিল না কেউ। নিজেদের বাঁচাতে এরা সব সময় এক-একটি দলে ঘুরে বেড়াত। দরকার হলে বিকট আওয়াজ করে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ও করতে এদের আটকায় নি।

এই জীব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ

আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদের সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। জীবনেও কেউ কখনো তাদের কোনও ছবি দেখি নি। মানুষের জন্ম মৃত্যু আবির্ভাব নিয়ে যে সমস্ত পণ্ডিতরা (নৃতত্ত্ববিদ্) গবেষণা করেন, তাঁরা শুধু পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে কতগুলো হাড়গোড় পরীক্ষা করে তবেই আবিষ্কার করেছেন, কয়েকলক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা দেখতে ঠিক কেমন ছিল।

আমাদের মানব জাতির প্র-প্র-প্র প্রপিতামহ কিন্তু দেখতে মোটেই আমার তোমার মত ভদ্র, সভ্য, সুন্দর ছিল না। তার গড়ন ছিল বেঁটে। সূর্য্যের কড়া রোদ আর শীতের দারুণ দাপটে তার গা-এর রং হয়ে যায় ঘোর তামাটে। মাথা থেকে আরম্ভ করে সারা গা, হাত, পা, সবই ঘন লোমে ঢাকা। হাতের আঙুলগুলো সরু সরু; তবে তাতে জোর বড় কম নয়। আঙুলগুলো দেখলেই বানরের আঙুল বলে ভুল করবে। কপাল নেমে এসেছে অনেক নীচে, আর চোয়াল ঠিক জংলী জন্তুজানোয়ারের মত। মুখের ভিতর জিব নাড়বার জায়গা তেমন নেই। তেমনি নেই তার কাপড় চোপড় পরবার কোন বালাই। জীবনেও সে কখনো আগুন দেখে নি। শুধু কদাচিৎ হয়তো দূরে আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে আগুনের হল্কা উঠতে দেখে চমকে উঠত।

মাথা গুঁজবার কোনও জায়গা ছিল না তাদের। এখনো যেমন আফ্রিকায় আদিম বাসিন্দারা বনে জঙ্গলে থাকে তেমনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাও থাকত বনে জঙ্গলে। ক্ষিদে পেলে তারা কাঁচা পাতা, গাছের শেকড় বাকড় তুলে খেত। নয়ত কখনো কখনো সারা দিনের চেষ্টায় হয়ত কোনো বুনো জন্তু শিকার করতে পারলে তাদের আর আনন্দের সীমা থাকত না। দলকে দল তখন বসে যেত সেই কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেতে। যতক্ষণ দিনের আলো থাকত ততক্ষণই তারা মাথা হেঁট করে এদিক সেদিকে খাবার জিনিসের সন্ধান করে বেড়াত। সন্ধ্যে হলে যে যেদিকে পারল লুকিয়ে রইল। সব সময় তাদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হ'ত। কারণ তারাও যেমন অন্য জীবজন্তু শিকার করে বেড়াত তেমনি অন্যান্য বড় বড় জানোয়ার আবার মানুষকে ধরতে পেলে রেহাই দিত না।

গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যের তাপের হাত থেকে বাঁচবার উপায় ছিল না। আবার শীতের সময় হয়ত বাচ্চাকাচ্চারা মায়ের কোলেই জমে মরে থাকত। সেই শীতের কঠিন আবহাওয়ায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা না মরে গিয়ে আরো তাড়াতাড়ি মানুষ হবার পথে এগোতে থাকে। তার নিজেরই দুটো হাত তাকে একাজে এগিয়ে নিয়ে যায়। আগে পাথর আর গাছের ডাল ভেঙে পূর্ব্বপুরুষেরা খাবার যোগাড় করত, এখন ঐ ডাল আর পাথরই তাদের আত্ম-

রক্ষার সাহায্য করল। একা একা কাজ করার চেয়ে দল বেঁধে কাজ করার সুবিধা অনেক বলে তারা সব সময় দল বেঁধে থাকত।

এভাবে বহুযুগ কেটে গেল। মানুষ তখন আগুন আবিষ্কার করেছে। আগুন আবিষ্কার করেই তার সাহস আর শক্তি দুইই বেড়ে গেল! তখন থেকেই মানুষ আস্তে আস্তে যন্ত্রপাতি বানায়। মনুষ্যত্বের প্রথম যুগে কিন্তু মানুষ তার বেশীর ভাগ অস্ত্রশস্ত্রই এদিক সেদিক থেকে যোগাড় করে নিত। নদীর পারের ধারালো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ তাই দিয়ে শিকার করত নয়ত আত্মরক্ষা করত। এর পরে মানুষ নিজের চেষ্টায় অস্ত্রশস্ত্র বানাতে শিখল। পাথরের অস্ত্র থেকে শুরু করেই একদিন মানুষ সত্যিকারের অস্ত্র বানায়।

মানুষ অস্ত্রশস্ত্র বানাতে শিখেই দেখল যে, খাবারের জোগাড়ে তাকে সারাদিন ঘুরতে ফিরতে হয় না। আগের চেয়ে অনেক সহজে এখন তারা শিকার করতে পারত। তাড়াতাড়ি খাবার পর্ব্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় মানুষ অন্যান্য কাজের জন্য আরও সময় পেল।

আদিম যুগের মানুষ সময়ের কোনও হিসাব রাখত না। জন্মতিথি, বিবাহ-উৎসব বা মৃত্যুতিথি এসবের কোনও বালাই ছিল না তাদের। দিন, সপ্তাহ, মাস বা বছর কি ঋতু এসব কোনটা সম্বন্ধেই তার কোনও ধারণা ছিল না!

এমন সময় ঘটল এক অঘটন। আবহাওয়ার যে কি হল কেউ বলতে পারে না। গ্রীষ্ম আসতে হল অনেক দেরী! গাছের ডালে ডালে ফল তখনো পাকে নি, পাহাড়ের চূড়ায় দেখা গেল সবুজ ঘাসের বদলে বরফের চাপ!

দেখতে দেখতে কোত্থেকে যেন হরেকরকম জীবজন্তু আশে পাশে চারদিক থেকে এসে সেখানে জমা হতে লাগল। দেখেই বোঝা যায় যে অনেকদিন তাদের খাবার জোটে নি। তাদের আওয়াজও এরা কেউ বুঝতে পারল না। নীচে কিন্তু এত জীবের খাবার দাবার ছিল না তাই স্বল্পে। কাজেই দুই দলে লাগল তুমুল লড়াই। কেউ কেউ সে লড়াই-এ মরে গেল। আবার অনেকে পালিয়ে গিয়ে বরফের ঝড়ে প্রাণ হারাল।

ক্রমে দুই পাহাড়ের মধ্যে বরফের চাপের আয়তন বাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে সেই হিমবাহ (Glacier) পাহাড় বয়ে নীচে নামতে থাকে। বিরাট সৈন্য-বাহিনীর মত বরফের স্রোত নামল। সে স্রোতের টানে বড় বড় পাহাড়ের চূড়া ধ্বসে পড়ে, মাটির বুকে গভীর খাদ হয়ে যায়; আর সেই স্রোতের সঙ্গে নামতে থাকে প্রচুর আবর্জ্জনা আর বড় বড় পাথর। লক্ষ লক্ষ বজ্রপাতের মত বিকট শব্দ করতে করতে সেই স্রোত পাহাড় জঙ্গলের উপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় সেখানের গাছগাছড়া জীবজন্তু সব ধ্বংস করে চলল। শত শত বছরের বিরাট গাছগাছড়া নিমেষের মধ্যে মচ মচ করে ভেঙে কুটি কুটি হয়ে গেল। তারপরেই শুরু হল তুষারপাত!

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলল বৃষ্টি! আমাদের বাংলা দেশের অন্তর্গত আসানসোলেও সে তুষারপাতের চিহ্ন দেখতে পাবে। সেখানের দেবদারু গাছ তখনকার তুষারপাতের ফলে জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। জমে-যাওয়া গাছ গুলো এখনো পাটনা মিউজিয়মে রক্ষিত হয়েছে।

গাছপালা সব গেল মরে আর জীবজন্তুরা দক্ষিণে পালিয়ে যেতে লাগল সূর্য্যের আলোর আশায়।

আদিম মানুষও অনেকে বাচ্চাকাচ্চাদের কাঁধে চাপিয়ে পালাল। অনেকে পালাতে না পেরে অন্য উপায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখল। সেই শীতের দাপটের পর মানুষ আর জঙ্গলে থাকবার কোনও প্রয়োজন বোধ করল না। মানুষ ততদিনে ভালকরে শিকার শিখে গেছে। সেই শিকারের চামড়া দিয়ে গা ঢেকে তারা শীতের কবল থেকে কতকটা বাঁচল। গুহা খুঁড়েও তারা শীতের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করে! আগে যে সমস্ত গুহায় ভালুক কি অন্য জন্তু জানোয়ার থাকত এখন মানুষ তাদের সব জায়গা দখল করে বসল।

আগুন পোহাতে পোহাতে হয়তো কখনো শিকার করা পাখী সেই আগুনে পড়ে গিয়ে সিদ্ধ হয়ে গেল। তখন থেকেই মানুষ সিদ্ধ মাংস খাওয়া অবিষ্কার করল।

এইভাবে হাজার হাজার বছর কেটে গেল। শীত আর গ্রীষ্মের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় মানুষ নিত্য নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে লাগল। তুষার স্রোত একদিকে যেমন আদিম মানুষকে ভীষণ পরীক্ষায় ফেলেছিল আর একদিকে তেমনি তাকে গড়ে পিটে মানুষ করে নিল।

মানুষ যখন জংলী ছিল

সেই দারুণ শীতের পর মানুষ জঙ্গল ছাড়ল। কিন্তু চাপে তারা তখনো নানা রকমের জীবজন্তু শিকার করেই প্রাণ বাঁচাত। কাজেই এমন শিকারের পেছনে মানুষ ধাওয়া করল যা তারা কয়েকদিন রেখে খেতে পারে। বড় বড় হরিণ, বুনো মোষ এই সব জন্তু একবার মারতে পারলেই ব্যস্। বেশ দিন কয়েক ধরে স্ফূর্তি করে খাওয়া যাবে! আদিম মানুষরা সব দল বেঁধে চলা-ফেরা করত বলেই বড় বড় জীবজন্তু শিকার করতে তাদের বাধত না। বেশী শিকার পাবার আশায় মানুষ তখন নিত্য নতুন অস্ত্রশস্ত্রও আবিষ্কার করতে লাগল। মানে তখন থেকেই মানুষ মাথা খাটাতে লেগেছিল। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দরকার হল হাত পা সব কিছুরই কাজ। দরকারী জিনিস যোগাড় করার জন্যে সমস্ত দলটাই নানা বুদ্ধি খাটিয়ে আর হাত পা চালিয়ে ধীরে ধীরে আপনাদের অনেক রকমে উন্নত করে তুলল।

বড় বড় পশু শিকার করলে রোজ রোজ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াত করা যায় না। ভবিষ্যতের জন্য খাবার মজুত করাও দরকার হয়। বাধ্য হয়ে তখন মানুষের অন্তত কিছুদিন একই জায়গায় থাকতে হ'ত। এক জায়গায় স্থির হয়ে বাসা বাধার আরও একটা কারণ ছিল। তা হচ্ছে আগের যুগের প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা। কোনও গুহায় ঢুকে মানুষ দলবল নিয়ে শীত, ঝড়, বৃষ্টি সব কিছুর হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করত।

একদল জঙ্গল ছেড়ে নদী ও হ্রদের তীরে চলে গেল মাছের লোভে। সেখানে জঙ্গল আর নদীর তীরের মধ্যের সরু জমিতে তারা বসবাস আরম্ভ করল। মাঝে মাঝে নদীতে বান এসে তাদের ঘর বাড়ী ভাসিয়ে দিত। তাই অনেক মাথা ঘামিয়ে মানুষ কাঠ কেটে উঁচু মাচানের উপর বাসা বাঁধতে শিখল। রাতারাতি কিন্তু তারা মাছ ধরা শেখে নি। আগে ডাঙাতে যেমন করে জীবজন্তু শিকার করত, তেমনি করে হাঁটু জলে বর্শা দিয়ে মানুষ মাছ মারত। পাখী ধরবার জাল বোনার শিক্ষা তারা এই সময় কাজে লাগিয়ে জাল ছুঁড়ে মাছ ধরত। আরও অনেক পরে মানুষ বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতে শেখে।

মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে হাতুড়ি, হাঁপর, লম্বা বর্শা এই সব অনেক রকমারী জিনিস বানিয়েছিল। ক্রমে বর্শা থেকে মানুষ তীর ধনুক আবিষ্কার করল। তীর দিয়ে অনেক দূরের পশুপাখী ও অনায়াসে মারা যেত। সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বানানো বংশ-পরম্পরায় প্রত্যেক দলের ভিতর শেখানো হত। কিন্তু তা হলে কি হয়। যে যত চেষ্টাই করুক না কেন, সব সময় হুবহু তার বাবা-কাকাদের মত জিনিস তৈরী করতে পারত না। বছরের পর বছর

ক্রো-ম্যাগনন

কাটল। মানুষ ক্রমেই নিজের অজান্তে তার যন্ত্রপাতি, থাকার জায়গা, আর কাজের ধরণ ধারণ বদলাচ্ছিল। মানুষের যন্ত্রপাতিরই যে শুধু পরিবর্তন হল তা নয়। ঐ সব কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেও বদলে যাচ্ছিল। অবিশ্যি তারা কেউ এক দিনেই বদলায় নি। কিন্তু যদি একজনের সঙ্গে হাজার হাজার বছর পরের আর একজনের তুলনা কর তা হলে দেখবে, দুজনের ভিতর আকাশ পাতাল তফাৎ। নিয়ানডারথ্যাল আর ক্রোম্যাগনন মানুষের মাথার ছবি দেখলেই তোমরা সে কথা বুঝতে পারবে।

নিয়ান ডারথ্যাল

এ দু-রকম মানুষের মধ্যে এত তফাৎ যে, একদল প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে ক্রোম্যাগনন মানুষের সঙ্গে নিয়ানডারথ্যাল মানুষের কোন সম্পর্কই নেই। আসলে কিন্তু তা নয়। এক জাত থেকেই আর এক জাতের উৎপত্তি।

সেকালের মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মাবলী কিছু জানত না। তারা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত কখন যেন কি হয়! মানুষ তখন শিকার করা, মাছ ধরা সব শিখেছিল তবু তাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিল না। কেউ অদ্ভুত কাজ করলে লোকে তাকে ডাইনী বলে ভয় করত। সমাজ কাকে বলে তা তারা জানত না। শুধু এটুকু অনুভব করত যে, একদলের সবাই যেন কোনও অদৃশ্য সূত্রে গাঁথা। বুঝতে পারত যে, সকলে আলাদা আলাদা বহু

হলেও কেমন করে যেন এক। মানুষ তখন ছিল রক্তের সম্বন্ধে বাঁধা। ছোট ছেলেরা মা-র সঙ্গে থাকত। এই ভাবে কুলের উৎপত্তি হয়। আদিম শিকারী মানুষদের সমাজ ছিল ঐ রকম এক পূর্ব্বপুরুষ থেকে নেমে আসা এক এক কুল। শিকার করা, যন্ত্রপাতি বানানো তারা পূর্ব্বপুরুষদের কাছে থেকেই শিখত।

তখনকার সব মানুষ পূর্ব্বপুরুষদের আদেশ পালন করাকেই সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য মনে করত। তারা ভাবত যে, অদৃশ্যভাবে পূর্ব্বপুরুষরা সর্ব্বক্ষণ নিজের বংশধরদের আগলে চলে। সকলের ভালর জন্য সকলে এক হয়ে কাজ করাও তারা পূর্ব্বপুরুষের আদেশ বলে মনে করত।

তারা কোনও পশুপাখী শিকার করলে ভাবত যে, ঐ পশু দয়া করে তাদের মাংস খেতে দিচ্ছে। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় তারা কল্পনাই করতে পারত না যে, নিজেরাই ঐ অত বড় জন্তু মেরেছে। তারা বুনো মোষ মারলে মনে করত যে বুনো মোষটাই দয়া করে মাংস খেতে দিচ্ছে! তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে জীবজন্তু দয়া করে ইচ্ছে না করলে কেউ তাদের মারতে পারে না। জীবজন্তুর দয়াতেই তারা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত এ বিশ্বাস থাকায় আদিম মানুষ ঐ সব শিকার করা জন্তুদের মনে করত নিজেদের রক্ষাকর্ত্তা বলে। পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কেই বা পূর্ব্বপুরুষ আর কে যে তাদের রক্ষাকর্ত্তা এ ধারণা আর পার্থক্য তারা গুলিয়ে ফেলত! তাদের মনে হত যে তারা বুনো মোষ, ঘোড়া বা ঐ জাতীয় অন্য কোনও জন্তু থেকেই জন্মেছে। সে রকমের কোনও পশু শিকার করেই মানুষ তার কাছে একজোট হয়ে ক্ষমা চাইত। পরে সেই পশুর চামড়া গায়ে দিয়ে তারা ভাবত যে, আর আপদ বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই।

এক এক কুলের এক একটি বিশেষ পশুচিহ্ন বা প্রতীক থাকত। তাকে ইংরাজীতে টোটেম (Totem) বলে। সেজন্যে ঐ সমাজের মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে ইংরাজীতে বলে টোটেমিক। প্রত্যেক কুলের মধ্যে নানা উপদল থাকে। ঐ উপদলের কোন উপকারী জন্তুর নামে তাদের নামকরণ হত।

মানুষ তখনো নিজের বলে কিছু ভাবতে শেখে নি। সে যে কুলের লোক সে কুলেরই একটা ভগ্নাংশ বলে নিজেকে মনে করত! সকলে মিলে এক সঙ্গে খাবার সংগ্রহ করত আবার সকলে একসঙ্গেই নিজেদের প্রয়োজন মত যতকিছু খাবার বাঁটোয়ারা করে নিত। কেউ বড়ছোট ছিল না! কিন্তু শিকারের সময় কুলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী লোককে নেতা বেছে নিয়ে অন্য সবাই তার আদেশ অনুযায়ী শিকার করত। নিজেদের মধ্যে কোনও গোলমালের ব্যাপার কিছু ঘটলে প্রবীন লোকেরাই তার মীমাংসা করত। আমাদের মধ্যে রাজা মন্ত্রী অমাত্য সব কত কি আছে; তাদের আমলে সে সব কিছু ছিল না।

মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের কাজ ছিল খুব কম।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই মামাবাড়ীতে মানুষ হত। তারা 'মা' ছাড়া আর কাউকে জানত না। মা হল সমাজের কর্ত্রী, আর বাবা হল আগন্তুক অতিথির মত। আমরা আজকাল দেখি যে, ছেলেরা বিয়ে করে বৌ ঘরে আনে। আর মেয়েরা অন্য পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তখন ছিল ঠিক উল্টো ব্যাপার। তখন মেয়েরাই বিয়ে করে স্বামীকে ঘরে আনত। যে স্বামী তেমন বেশী খাবার যোগাড় করতে পারত না—তার কপালে ছিল অনেক দুঃখ। যত ছেলে মেয়েই থাকনা কেন, যে কোনও মুহূর্ত্তে তাকে লোটা-কম্বল গুটিয়ে পালাতে হতে পারে! সে আদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য নেই কারুর! মা-এর এত ক্ষমতা বলে এ সমাজের নাম মাতৃ-শাসন (Matriarchate)।

তখনো এখনকার মত বিবাহব্যবস্থার প্রচলন হয় নি। সবাই একই সঙ্গে থাকত বলে কে যে কার বাবা তা ঠিক করা যেত না। যে কোনও পুরুষ অন্য যে কোনও মেয়ের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত থাকতে পারত। তা কেউ দোষের মনে করত না। ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেলস্ এ রকম বিয়ে করাকে বলেন 'যূথ-বিবাহ' (Group Marriage)। ছেলেমেয়েরা সবাই মা-এর দিক থেকে বংশ পরিচয় দিত।

আমাদের কাছে এ সমস্তই অদ্ভুত মনে হবে। কিন্তু কখনো ভেবো না যে, এই সব ব্যাপার শুধু জংলীদের দেশ আফ্রিকা বা আমেরিকা—বা ওই রকম দেশেই সম্ভব! সে ধারণা ভুল। সমস্ত পৃথিবীময়ই এরকম সমাজ এককালে প্রচলিত ছিল। তবে কোথাও সে ব্যবস্থা অনেক আগে ভেঙে গেছে আর কোথাও হয়ত এখনো ভাঙে নি।

এত সভ্য ইংরাজদের ভিতরেও এখন ভাষার মধ্যে দিয়ে সে যুগের আভাস পাওয়া যায়। তারা নেফিউ (Nephew) বলতে ভাইপো, ভাগনে দুইই বোঝায়। মাদ্রাজের তামিল ব্রাহ্মণদের ও মিশর, ইরাণ, এইসব দেশের রাজবংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভাই-বোনে বিবাহের অনেক নজীর আছে।

এ সমাজে সবাই সবার সমান বলে সমাজতাত্ত্বিক ভাষায় একে বলে **"আদিম সাম্যবাদী"** সমাজ।

জংলী সমাজের শেষের স্তরে মানুষ একটু আধটু করে গ্রামে বসবাস করতে শুরু করেছিল। তখন কতগুলো পরিবার এক হয়ে থাকা আরম্ভ হয়। তাকে বলা হয় কমিউন (Commune)। কাঠের বাসনকোসন, হাতে বোনা বল্কল ও নব-প্রস্তর-যুগের (Neolithic) ধারালো অস্ত্রশস্ত্র সেই সময় মানুষ ব্যবহার করত। আগুন দিয়ে গাছের গুঁড়ি পুড়িয়ে অনায়াসে নৌকোর মত তাকে জলে ভাসিয়ে তারা খাল বিল পাড়ি দিত।

এঙ্গেলস্ বলেন যে, আদিম-সাম্যবাদী-সমাজের ভিতরেই মানুষ দুটি একটি করে নিজের দরকারী জিনিস বানাত। প্রথম প্রথম তারা গোষ্ঠীর বাইরের লোকজনের সঙ্গে সেই সব ছোটখাট জিনিস পত্তর লেনদেন করত। পরে দেখা গেল যে, অনেকে নিজেদের দরকারী জিনিস ছাড়াও এমন সব জিনিস বানাত যা বদল করে তারা অন্য অনেক রকম জিনিস জোগাড় করত। সাম্যবাদী সমাজের শেষের দিকে কমিউনের ভিতরেও ছোটবড়র তফাৎ দেখা দিয়েছিল।

অতীতের ভাষা

অতীতের গুহায় আমরা যে মানুষের খোঁজ পাই তাকে নিয়ানডারথ্যাল মানুষ বলে। জার্মানীর অন্তর্গত নিয়ানডারথ্যাল উপত্যকায় ঐ জাতীয় মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল বলেই ঐ রকম নামকরণ হয়েছে। ম্যামথ নামে যে অতিকায় হাতী এক সময়ে পৃথিবীতে চলাফেরা করত এরা তাদের সমসাময়িক।

এদের মুখের গড়ন এমন যে, তাতে আমাদের মত স্পষ্টভাষায় কথা বলা যেত না। কিন্তু তবু তাদের কথা বলতে হ'ত। এক সঙ্গে সবাই দলবেঁধে কাজ করতে হলে কথা না বলে কি উপায় আছে? নানা অঙ্গভঙ্গী আর ইঙ্গিত ইশারায় মানুষ তখন মনের ভাব প্রকাশ করত। একটা কিছু "দাও" বলতে হলে হাত চিৎ করে এগিয়ে দিত। ধনুক বোঝাতে হলে একহাতে কাল্পনিক ধনুক ধরে অন্যহাতে তাতে টঙ্কার দিত। নেকড়ে বাঘ বোঝাতে হলে হাতের দুটো আঙুল কানের মত করে দেখাত।

আমেরিকায় এখনো অনেক আদিম রেড ইণ্ডিয়ানরা এরকম ভঙ্গী-ভাষায় কথা বলে। মানুষ কিন্তু তখনকার দিনেও শুধু ভঙ্গী-ভাষায় কথা বলেই সন্তুষ্ট ছিল না। তারা অনবরত চেষ্টা করত কি করে আরও ভাল করে কথা বলতে পারে। প্রথম প্রথম তাদের এক শব্দ থেকে আর একটি শব্দের পার্থক্য বোঝা যেত না। গোড়ার দিকে ভঙ্গী-ভাষাকে সাহায্য করাই ছিল জিবের কাজ। ক্রমে ক্রমে জিবের জড়তা কমে গেল। তখন ভঙ্গীর চেয়ে কথার চলন হল বেশী।

লেখার উদ্ভব হল এরও বহু যুগ পরে। প্রথম যুগের লেখাও ছিল যেন ছবির মিছিল। আমরা হাজার চেষ্টা করলেও সে লেখার মানে বুঝতে পারব না।

মিশর দেশেই প্রথম লেখার জন্ম। আজ চারদিকে বই, খবরের কাগজ দেখতে দেখতে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, ভাবতেই পারি না এমন

কোন দিন থাকতে পারে যে মানুষ লেখাপড়া জানত না। সত্যি কথা বলতে কি লেখার আবিষ্কার খুব বেশী দিন আগে হয় নি।

খৃষ্টের জন্মেরও একশত বছর আগে প্রাচীন গ্রীকরা মিশরে গিয়ে সমস্ত উপত্যকাময় ছড়ানো নানা হিজিবিজি আঁকা পাথর দেখতে পায়। কিন্তু তখন তারা মোটেই সে সবের অর্থ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। তারপর কোথায় দিয়ে যে আরও সতেরো শতাব্দী কেটে গেল কেউ তার খোঁজ রাখে না। অবশেষে ১৭৯৮ খৃঃ ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অধীনে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ নীল নদীর বদ্বীপে একটি ঐ রকম হিজিবিজি লেখা পাথর পান। তাতে নানা হিজিবিজির পাশে গ্রীক ভাষাতেও কতগুলো লেখা ছিল। ১৮০২ খৃঃ শাঁপলিঁয় নামে একজন অধ্যাপক সেই ভাষার অর্থ বারকরার কাজে লাগলেন। এক দুই করে অনেক বছর কেটে গেল। তবু কোনও তথ্য আবিষ্কার হল না। অবশেষে অধ্যবসায়ের জয় হল। ১৮২৩ খৃঃ তিনি জানালেন যে, ঐ সব হিজিবিজির মানে বের করেছেন। দুঃখের বিষয় তিনি বেশীদিন আর বাঁচেন নি। তাঁর চেষ্টাতেই পৃথিবীর সবাই মিশরের ভাষা ও লেখা সম্বন্ধে নানা খবরাখবর জানতে পেরেছে।

মিশরের সেই ভাষাকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক্‌স্ (Hieroglyphics)। এর অর্থ হচ্ছে "পবিত্র লেখা"! প্রাচীন মিশরীয় ভাষা ভঙ্গী-ভাষার চেয়ে অনেক উন্নত। তুমি যদি শাঁপলিঁয় হতে তাহলে দেখতে পেতে যে, একটা হিজিবিজি লেখার ভিতরে রয়েছে করাত হাতে করা মানুষ! নিশ্চয়ই মনে করতে যে এতো সোজা কথা। কোনও মানুষ করাত দিয়ে কাঠ কাটছে! কিন্তু আবার আর এক জায়গায় আশি নব্বই বছরের রাণীর কাহিনীর মধ্যে যদি সেই করাত-হাতে-মানুষের ছবি পাও তাহলে কি বলবে? আশি বছরের রাণী নিশ্চয়ই করাত দিয়ে কাঠ কাটবেন না? তবে?

এই হেঁয়ালীর সমাধান করেই তো শাঁপলিঁয় আজ এত বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি জানালেন যে মিশরীয়রাই প্রথমে 'শব্দানুপাতিক লেখা' (Phonetic Writing) আবিষ্কার করেছিল। এমন সব অক্ষর তারা আবিষ্কার করে যা

দিয়ে আমাদের কথ্য ভাষার শব্দ (Phone) বোঝান যায় ও সমস্ত কথাই লেখার ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যায়। আগের সেই করাত-হাতে লোকটিরই কথা ধরুন।

করাতের ইংরাজী হচ্ছে 'স' (Saw)। মানে কিন্তু করাতও হয় আবার 'See' ক্রিয়ার অতীতকালও বোঝায়। প্রথম যুগে 'করাত' অর্থেই 'স' কথা ব্যবহৃত হ'ত। আরও পরে করাতের চেয়ে 'কেউ দেখেছিল' অর্থেই এর প্রচলন হয় বেশী। তারও কয়েক শতাব্দী পরে দুটো অর্থের কোনটি বোঝাতেই এ শব্দের ব্যবহার হ'ত না। শুধু মাত্র 'এস' শব্দটি (s) বোঝানই এর কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

উপরের ছোট বাক্য থেকে জিনিসটা পরিষ্কার হবে। ইংরাজীতে, 'আই'-এর

মানে 'চোখ', নয়তো 'আমি'। একটি 'বী' বলতে হয়' মৌমাছি', নয়তো 'থাকা' ক্রিয়া বোঝায় (to be)। এ দুটোর পরে আছে 'লিফ'; তার মানে

হতে পারে তিন রকম: leaf (পাতা) leave (ছুটি পাওয়া) নয়তো (lieve)। এ তিনটি কথারই উচ্চারণ এক রকম। তারপরেরটি হচ্ছে আবার চোখ (আই)। অব-

শেষে এটা একটি জিরাফের ছবি বলে মনে হয়।

তা হলে এখন সেই ছবির কি মানে দাঁড়াল? ইংরাজীতে এর মানে হ'ল—I believe I see giraffe অর্থাৎ "জিরাফ দেখছি বলে মনে হচ্ছে।"

মানুষের বর্ব্বর অবস্থা

জনযুগ

জংলী সমাজের শেষের দিকে মানুষ কতগুলো পরিবারের সঙ্গে এক হয়ে বসবাস করত। তাকে কমিউন বলা হ'ত। এর ঠিক পরের অবস্থাকে বলা হয় "জনযুগ"।

'জনযুগ' কেন বলা হয় জানো? প্রত্যেক 'জন'-এর ভিতর শুধু একই বংশ থেকে জন্মানো লোকজনই থাকতে পারত। এইসব ভিন্ন ভিন্ন 'জন' নিয়েই তখনকার সমাজ গড়ে উঠত। সম্পর্ক ধরা হ'ত মা-এর দিক থেকে। ভারতীয় আর্য্যরা যখন আফগানিস্থান কিংবা সিন্ধুনদের তীরে বসবাস করত, তখন থেকেই তারা ভিন্ন ভিন্ন 'জন'-এ বিভক্ত ছিল। শিবি-'জন' যেখানে বসবাস শুরু করে সে জায়গার নাম হয় 'শিবি জনপদ'। 'মদ্র'রা যেখানে যায় তার নাম হয় 'মদ্র জনপদ'।

ঐ সময় পর্য্যন্ত সমাজে মেয়েদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বেশী। যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকলে 'জনে'র সবাই মিলে নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে নেতা নির্ব্বাচন করত। যুদ্ধ বাধলে আবার আর একজন নেতার দরকার হ'ত। একজন নেতা মরে গেলে সে জায়গায় তখুনি নতুন একজন নেতাকে বসানো হ'ত। নেতার ছেলেই যে নেতা হবে তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। মজার ব্যাপার, না? নেতার ছেলে হলেই নেতা হ'তে পারত না। আগের নেতার ভাই কিংবা ভাগ্নেকে নতুন নেতা করা হ'ত বেশীর ভাগ সময়। কতগুলো 'জন' মিলে একটি 'কুল' তৈরী হ'ত। কাউকে নতুন নেতা করতে হলে সমস্ত কুলেরই মত নিতে হ'ত। কি মেয়ে কি পুরুষ সবাই একসঙ্গে ভোট দিয়ে তখন নেতা নির্ব্বাচন করত। যদি সেই নেতা তাদের ইচ্ছামত না চলত তাহলে আবার সবাই মিলে তাকে তাড়িয়েও দিতে পারত। নেতার কাজ হচ্ছে সকলের কিসে ভাল হয়, তাই

দেখা। কাজেই, যে যখনই তা না ক'রে নিজের সুখ সুবিধা বেশী দেখত, তখনই সবাই মিলে তাকে তাড়িয়ে দিত।

বিয়ের সম্পর্কে 'জনে'র সকলকে হরেকরকম বিধিনিষেধ মানতে হ'ত। কেউ একই 'জনে'র মেয়েকে বিয়ে করতে পারত না!

আমাদের দেশে 'জন' কথার চেয়ে 'গোত্র' কথাটা বেশী চলে। 'গোত্র' কথার এক মজার মানে আছে। এক সময় আর্য্যদের মধ্যে গরুই ছিল সব চেয়ে দামী সম্পত্তি। একই জায়গায় থেকে যে সমস্ত লোক এক এক গরুর পাল দেখাশোনা করত তাদেরই বলা হ'ত এক 'গোত্রে'র লোক। একটু খোঁজ করলে জানতে পারবে যে এখনো হিন্দুদের এক গোত্রের মধ্যে বিয়ে হয় না।

'জনে'র মধ্যে তখনও 'আমার' 'তোমার' ভেদাভেদ দেখা দেয়নি। যা কিছু জিনিসপত্তর, সহায়সম্পত্তি, সমস্ত 'জনে'র দখলে থাকত। কেউ মরে গেলে তার নিজের যা কিছু সম্পত্তি তা পেত 'জনে'র বাকী সকলে।

'জনে'র মধ্যে দরকার মত সকলে সকলকে সাহায্য করত। বাইরের শত্রু আক্রমণ করলে সবাইকে লড়তে হ'ত একসঙ্গে। প্রত্যেক 'জনে'র বিশেষ বিশেষ নামও থাকত। সেই নাম ঐ 'কুলের' ভিতরের অন্য কোন 'জন' ব্যবহার করতে পারত না।

বাইরের বিজিত শত্রুকে সময় সময় 'জনে'র ভিতর নেওয়া হ'ত। শত্রুকে হারিয়ে দিয়ে হয় তাকে মেরে ফেলা হ'ত নয় তাকে 'জনে'র মধ্যে টেনে নেওয়া হ'ত। 'জনে'র ভিতর এলে সে অন্যের মতই একজন হয়ে যেত। তাকে আর কেউ ঘেন্না করত না বা অন্য কোনও রকমে শাস্তি দিত না।

অনেক সময় খুব বংশ বৃদ্ধি হ'লে, কয়েকটি 'জন' মিলে আগে হ'ত **'বেরাদরী'** (Phratry)। তারপর কয়েকটি বেরাদরী মিলিয়ে হ'ত কুল।

আমাদের চারপাশে কত পুলিশ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, থানা, কাছারী—আরও কত কি আছে! কিন্তু তবু কি চুরি চামারী কমেছে? মোটেই না। মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। কিন্তু আগের 'জন'-সমাজ কত সুখের ছিল! তাদের পুলিশও ছিল না, থানা, আদালতও ছিল না।

ঝগড়াঝাটি কিছু হলেই 'জনে'র সমস্ত লোক এক হয়ে মিটমাট করে ফেলত। জমীজমা যা কিছু থাকত, তা সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে ভাগ করে দেওয়া থাকত। গরীব বলে কেউ ছিল না। সকলেই ছিল সমান।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে যত দিন যায় ততই 'জন'এর ভিতর নানা নতুন পরিবর্ত্তন আসতে থাকে।

'জন'-সমাজে মানুষ পশুপালন শিখেছিল। আগে মেয়েরা কোনও রকমে বাড়ীর আশপাশে মাটি খুঁড়ে শাকসব্জী বুনত। কিন্তু অনেক সময় ঘাসে এমন করে সব ভরে থাকত যে ফলনই হ'ত না। তখন দেখা গেল চাষ-বাস না করে গরু ভেড়া চরানো অনেক লাভের। কিন্তু গরুভেড়ার পাল যতই বাড়ছিল, ততই মানুষের এক জায়গায় থাকাও কঠিন হ'য়ে উঠছিল। এক জায়গার মাঠের ঘাস ফুরিয়ে গেলে দলবল শুদ্ধ পশুর পালের পিছনে পিছনে অন্য জায়গায় চলে যেতে হ'ত। এইভাবে মানুষ হল যাযাবর।

চলার পথে কোনও চষা জমী থাকলে এরা তার ফসল কেড়ে নিত। লুঠ-তরাজ, চুরি, ডাকাতি করতে তাদের আটকাত না। কখনো কখনো কাছের চাষীদের সঙ্গে তারা জিনিসপত্তর কেনাবেচাও করত। জোর করে বাইরে থেকে লোক ধরে এনে 'দাস' করে রাখা এখন থেকেই শুরু হয়।

একদল মানুষ যেমন 'জনযুগে'র শেষের দিকে পশুপালন করতে লাগল আর একদল তেমনি লাঙ্গল আবিষ্কার করে ভাল করে চাষবাস শুরু করে। লাঙ্গল দিয়ে মানুষ তুলার চাষ আরম্ভ করে। লোকজনের বসতি আগে অনেক কম ছিল। কুলের সকলের থাকবার 'বড় বাড়ী' আর তার চারপাশের শিকারের জঙ্গল নিয়েই ছিল মানুষের বাসস্থান। তার বাইরেই গহন অরণ্য। এ সব গহন জঙ্গলই ভিন্ন ভিন্ন কুলের সীমানার কাজ করত। মেয়ে আর পুরুষ আলাদা আলাদা কাজ করত। পুরুষ গেল যুদ্ধে, সারাদিন খেটেখুটে হরেক রকম জীবজন্তু শিকার করল, নদীতে নদীতে ঘুরে ঘুরে মাছ ধরল। রান্নার সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ যোগাড় করাও ছিল তাদেরই কাজ। তা ছাড়া যন্ত্রপাতি বানাতেও সেই তারাই। মেয়েরা সারাদিন থাকছে ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত; ভাত রাঁধছে—

এই ভাবে মানুষ হল যাযাবর

তাঁত নিয়ে ঠকাঠক্ ক'রে তাঁত বুনছে। এখন হ'ল দুটো ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব। পুরুষের রাজত্ব হ'ল বাইরে—আর মেয়েদের বাড়ীর ভিতরে।

পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষ কিন্তু এমন ছিল না। এশিয়ায় যারা থাকত, তারা পশুপালন শিখেছিল। গৃহপালিত গরু ভেড়ার দল নিয়ে তারা চলাফেরা করত। বনের বুনো গরু শিকার করায় অনেক হাঙ্গামা। আর, একবার গরু পালতে পারলে বছর বছর অনেক বাচ্চা দেবে। কয়েক বছর পর আবার সেইসব বাচ্চাদের হবে বাচ্চা। নতুন করে রোজ গরু ধরবার হাঙ্গামা থাকবে না। এরা তখন তাই পশুপালন ছাড়া অন্য কাজে মন দিতে চাইল না। তারা দুধ খেল, দুধ থেকে আরও নানা জিনিষ তৈরী করতে শিখল, গরুভেড়া মেরে চামড়ার যোগাড় করল। ক্রমে তাদের যা দরকার তার চেয়েও বেশী জিনিষ জমল তাদের হাতে। তখনই শুরু হ'ল রীতিমত কেনাবেচা—'বিনিময়'। আগের যুগেও মাঝে মাঝে মানুষ কেনাবেচা করত, কিন্তু এখন হ'ল সত্যিকারের ব্যবসার গোড়াপত্তন।

ব্যবসায়ের মূলধন দরকার হয়। তখনকার লোকের মূলধন ছিল গরুভেড়া। পশুপালকদের ছিল অজস্র গৃহপালিত পশু। অন্য সব কুলকে তারা সেইসব গরুভেড়ার লোভ দেখাত। গরুভেড়া কেনা-বেচাই ছিল তখনকার সবচেয়ে বড় কারবার। গরুভেড়ার ব্যবসা এত বেশী হ'ল যে মানুষ অন্য সব জিনিষের দাম দেবার সময়ও গরুর তুলনা দিত। এখন তোমরা কোন জিনিসের দাম বল পাঁচ কি দশ টাকা, তখনকার লোক হ'লে বলত 'দশ গাভী' দাম। গরু-ভেড়াই তখন টাকা পয়সার কাজ চালাত।

লোহা তখনো আবিষ্কার হয়নি। মানুষ সোনারূপার গহনা পরে ঘুরে বেড়াত। তামা, ব্রঞ্জ এই সব ধাতু দিয়ে খালি তারা দু'চারটি যন্ত্রপাতি বানাতে পারত।

যতই পশুপালন ও চাষবাস বেশী হ'ল ততই পুরুষদের কাজ গেল বেড়ে। এত কঠিন কাজ মেয়েরা তেমন ভাল করে করতে পারত না। আগের দিনে গৃহপালিত পশু ছিল 'জনে'র সবাইকার। কেউ নিজের বলে

সেগুলো দাবী করতে পারত না। কিন্তু পরে 'জনে'র কর্তারা আস্তে আস্তে সেগুলো নিজেদের করে নেন। নতুন সম্পত্তি হাতে পেয়ে তাদের ক্ষমতা গেল বেড়ে।

জংলীযুগে পুরুষ করত বাইরে খাবার যোগাড়, আর মেয়েরা করত ঘর-গৃহস্থালী। তখন মেয়েদের কাজটাই ছিল প্রধান, তাই 'মাতৃ-শাসনে'র উদ্ভব হয়েছিল। আর পশুপালনের যুগে কি হল? এখনো মেয়েরা ঘর বাড়ীর কাজই করত আর পুরুষরা করত বাইরে খাবার যোগাড়। তবে পশু-পালন, চাষবাস, আর নানা দামী ধনসম্পত্তি অধিকার করে পুরুষের হাতে সব সময়ই বাড়তি জিনিসপত্তর, খাবারদাবার জমা থাকত। তার কাজের দামও গেল বহুগুণ বেড়ে। মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ হয়ে দাঁড়াল নগণ্য। বাইরের পুরুষের কাজের ধরণধারণ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মেয়েদের ঠেলে দিল ঘরের কোনে। মেয়েরাও আপত্তি করতে পারলনা। তারা হ'ল পুরুষের অধীন!

সেই যে মেয়েরা হল অধীন—আজ ও তার শেষ হয়নি। এঙ্গেলস্ বলেন-যে মেয়েদের মুক্তি আনতে হলে বাইরের কাজে তাদের টানতে হবে বেশী। যতই বাইরের জীবনে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে যোগ দেবে ততই তাদের মুক্তি হবে সহজ। তা নইলে শুধু স্ত্রীস্বাধীনতা বলে চীৎকার করলে কিছু হবে না! যতই যন্ত্রপাতির চলন আমাদের মধ্যে বেশী হচ্ছে—মেয়েরাও ততই পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। সেজন্তেই সোভিয়েট রুশিয়াতে আজ মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পেরেছে। সেখানে মেয়েরা ঘরকন্না করে, সন্তান প্রতিপালন করে, আবার বাইরে কাজও করে!

মেয়েদের আধিপত্য কমলেও তখনো কিন্তু কাজের অন্ত ছিল না তাই বলে। তারা কাপড় বুনত, ফসল বেছে ঘরে তুলত, আর সন্তান প্রতি-পালন করত। কিন্তু আগের মত আর তারা সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্রী রইল না। বাড়ীর কাজে মানুষ এখন ধমক খেত না, বরঞ্চ তারাই মেয়েদের ধমকাতে লাগল। পুরুষরা 'জন' থেকে বেড়িয়ে গেলে চাষবাসের ক্ষতি হয়

বলে এখন থেকে বিয়ের পরে আর তারা মেয়েদের পরিবারে চলে যেত না। সবাই চাইত পুরুষদের আটকে রাখতে। আগে তো আর এ ব্যবস্থা চলত না! কাজেই নতুন হালচাল শিখে নিতে অনেক দেরী হ'ল সকলের।

বাঁয়ে মার্ক্স—আর ডানে এঙ্গেলস্

আগের সমস্ত সংস্কার খুব ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে। তখনকার সমাজে চল ছিল না বলে বুড়োরা এসব জিনিষ ভাল চোখে দেখত না। তারা বলত, এ আবার কি? আমাদের আমলে তো এমন ছিল না! চিরদিন দেখে এলাম বর ক'নের বাড়ী চলে যায়—আর এরা কি বলে! বরই ক'নেকে বাড়ী নিয়ে আসবে! সব গেল, জাত ধর্ম্ম আর কিছু থাকল না! যে বিয়ে ক'রে বৌকে বাড়ী নিয়ে যেত তাকে সবাই দোষ দিত। কাজেই সকলে গোপনে চুরি করে বিয়ে করে বৌকে বাড়ী নিয়ে যেত। ক্রমে ক্রমে বহু যুগ পরে সকলে এই নতুন বিয়ে ব্যবস্থা মেনে নিল।

মেয়েরা নতুন সংসারে এসে স্বামী, শ্বশুর সকলের সেবা করতে লাগল। তাদের সে আগের স্বাধীনতা আর রইল না। পুরুষই হ'ল সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। এই ব্যবস্থাকে পণ্ডিতরা বলেন **'পিতৃশাসন'**—মানে, যেখানে পিতার শাসনে সবাইকে থাকতে হয়।

পিতৃশাসন

পিতৃশাসন স্থাপনের সময়ে মানুষেরও অনেক উন্নতি হয়। এখন আমাদের ঘরে ঘরে কত চমৎকার জিনিসপত্তর আছে। রংবেরংএর চীনামাটির বাসন, কত সুন্দর সুন্দর চায়ের কাপ, ডিস্, কত ছুরি কাঁচি—তার ইয়ত্তা নেই।

এসব জিনিষ এক মুহূর্ত্ত কাছে না থাকলে যেন সবাই চোখে অন্ধকার দেখি! কিন্তু এসব একদিনে হয়নি তা জানো কি?

'জনযুগে'র শেষে মানুষ তামা আর ব্রঞ্জ আবিষ্কার করে। অনেক আগে পৃথিবীতে তামার তাল কুড়িয়ে পাওয়া যেত। চারদিকের সেই সব সবুজ তাল হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পরে আগুনে ঢালিয়ে মানুষ নিজের কাজের মত করে তৈরী করে নিত।

এর আগেই বলেছি যে মিশরে প্রথম লেখা শুরু হয়। তামার ধাতুর আবিষ্কারও হয় সেখানে প্রথম। তখন থেকে মানুষ তামার অস্ত্রশস্ত্র বানাতে থাকে। এবার জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে সেখানে চাষবাস করা আগের চেয়ে অনেক সহজ হ'ল। জঙ্গলের শত্রু বাঘ ভালুকের হাত থেকে বাঁচার জন্যেও মানুষ ঐ সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত।

জঙ্গল পরিষ্কার করে যে সব জমীতে নতুন চাষবাস করা আরম্ভ হয় সে সব জমী কাদের সম্পত্তি বলতে পার? এখন হয়তো কত বড় বড় জমিদারকে তোমরা বলতে শুনে থাকবেঃ 'আমার দশ হাজার বিঘা জমী তবুও কিছু করতে পারি না।' কিন্তু তখনো জমী 'আমার' 'তোমার' কি অন্য কারুর নিজের সম্পত্তি ছিল না। জমীতে ছিল সমস্ত 'জনে'র কর্তৃত্ব। মানে কোন লোক নিজের ইচ্ছে কি খেয়াল খুসী মত জমী কেনাবেচা করতে পারত না। তবে চাষের যন্ত্রপাতি ছিল প্রত্যেক মানুষের আলাদা।

কিন্তু মানুষের লোভ একবার বাড়তে থাকলে আর থামে না। যখনই লোক অস্ত্রশস্ত্র আরও অনেক জিনিসকে নিজের সম্পত্তি করে ফেলল তখন থেকেই সে চাইল ঐ সম্পত্তি আরও বাড়াতে। এক এক দল নানা উপায়ে নিজেদের পশুর সংখ্যা বাড়াতে লাগল। কোন পরিবার ক্ষেত চষতে লাগল। ফলে একদিন দেখা গেল যে সমাজে আগের মত সেই সমান সমান ভাব আর নেই। প্রত্যেক 'জনে'ই জোর করে বাইরের 'জন'থেকে বিজিত অনেক দাস থাকত। শুধু তাই নয় এখন 'জনের' মধ্যেই বড় ছোটর পার্থক্য দেখা দিল। এক এক পরিবারের এক একরকম সম্পত্তি হওয়ায় আগের সেই সাম্যবাদী সমাজ আর টিকে থাকতে পারল না।

'জনের' মধ্যে তখন আগের মত বিয়ের ব্যবস্থাও রইল না। বাপ মা, ছেলে মেয়ে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার আলাদা হয়ে পড়ল। এই সমস্ত পরিবার নিয়েই ক্রমে আধুনিক সমাজের গোড়া পত্তন হয়। যে পরিবারের যেমন ইচ্ছে হ'ত তারা তেমনি চাষবাস করত।

* * *

আরও বহু যুগ পরে মানুষ লোহা আবিষ্কার করেছিল।

আগের মিশর, মেসোপোটেমিয়া ও প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকার ভারতীয়রাও লোহার ব্যবহার জানত না। লোহার পরিচয় আমরা প্রথম পাই খ্রীষ্টপূর্ব্ব চার পাঁচ শতাব্দীতে। তখন এক মজার ব্যাপার হ'ত। তামার কোনও জিনিষকে লোকে বলত লোহা। লঙ্কাদ্বীপে এক বিরাট মঠ আছে। তাকে বলা হয় 'লৌহ-মহাপ্রাসাদ'। কিন্তু সেটা মোটেই লোহা দিয়ে তৈরী হয়নি। আগাগোড়া তামায় তৈরী হলেও তার নাম হ'ল 'লৌহ-প্রাসাদ'। সংস্কৃতে লোহার নাম হ'ল 'অয়স্'। এই অয়স্ শব্দ থেকেই ক্রমে ক্রমে ইংরাজী 'আয়রণ' শব্দের জন্ম হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক কালে 'অয়স্' শব্দ তামা বোঝাতেই ব্যবহার করা হ'ত। তামার পরে যখন লোহা অবিষ্কার হ'ল তখন তার নতুন নামকরণের চেষ্টা হ'ল। প্রথম প্রথম তামা বোঝাতে লোকে বলত 'তাম্র অয়স্'— আর লোহা বোঝাতে 'কৃষ্ণ অয়স্'। [illegible]ও অনেক পরে তামার জন্যে 'তাম্র' লোহার জন্যে শুধু 'অয়স্' কথার সৃষ্টি হয়।

লোহার মত ধাতুকে নিজের কায়দায় এনে ফেলে মানুষের শক্তি গেল বহুগুণ বেড়ে। লোহার লাঙ্গলের ফলা দিয়ে এখন কত ভাল করে জমী চষা যায়। আবার লোহার কুড়ুলে গাছকাটা কত সহজ! ছুতোররা লোহার অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে নিত্য নতুন জিনিস বানাতে লাগল। এমনি করেই আগের যুগের অসহায় মানুষের সহায়সম্পত্তি বাড়তে লাগল দিন দিন। এ সব সম্পত্তি আর আগের মত 'জনে'র সকলের হাতে গেল না। খালি কয়েকজন লোক এগুলো দখল করে ফেলল। মানুষ কাপড় বোনা শিখল, ভাল ভাল বাসনকোসন বানাতে পারল, শক্ত শক্ত বাড়ীঘরও তৈরী করল। আগের কুঁড়ে ঘরের জায়গায় দেখা দিল ইট আর পাথরের দালান কোঠা!

আগে একজন লোকই সব রকম কাজ করত। এখন একজনই যতকিছু কাজ একা করত না। কেউ হয়তো দিনরাত ছুতোরের কাজই করছে। ঠকাঠক্ করে কাঠ কাটছে আর হরেক রকম আসবাব পত্র বানাচ্ছে। আবার কেউ হয়তো খালি দিনরাত কাপড় বুনছে। তার বাড়ীতে তাঁত চলার বিরাম নেই। কেউ হয়তো শুধু চাষাবাদ নিয়েই ব্যস্ত থাকে,

আবার কেউ পশুপালন ছাড়া অন্য কাজে মন দেবার অবসর পেল না। এইভাবে কাজের ভাগ হওয়াকে বলা হয় 'শ্রম বিভাগ'। বর্ব্বর যুগের শেষে পশুপালক ও কারিকরের শ্রমবিভাগ বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এইরকম নানাভাবে লোকজনের কাজকর্ম্ম অনেক বেড়ে গেল। দেখতে দেখতে প্রত্যেক 'জনে'র লোকও গেল বেড়ে। এত বড় বড় 'জন' মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে রাখা হয়ে দাঁড়াল ভয়ানক কঠিন। আগের মত তো এখন সবাই সমান নয় যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুখ সুবিধা দেখে বুঝে শুনে কাজ করবে! প্রত্যেক 'জনের'ই দুই শত্রু ছিল—ভিতরের আর বাইরের। যে সব গরীব সমাজে ছিল অত্যাচারিত তারা সব সময় বিদ্রোহ করতে চাইত। আর বাইরের শত্রু তো যুদ্ধ করবার জন্যে পা বাড়িয়েই রয়েছে। কাজেই সেই সব শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কতগুলো একই ধরণের 'জন' একজোট হয়ে থাকতে চাইল।

যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে তাদের সব সময়ের সেনাপতি দরকার হ'ল। আগের 'জনযুগে'র যেমন সকলে মিলে সভা করার ব্যবস্থা ছিল এখন তাই ভেঙে, বাড়িয়ে সেনাপতি, প্রধানদের সংঘ আর কুলের সকলের সভা—এই তিনটি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে দেশ শাসন হ'ত।

লোকের লোভ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লুঠতরাজ আর যুদ্ধও বেড়ে গেল। কেউ আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের কুলের চারদিক ঘিরে বড় বড় দেয়াল দিয়ে দিল আর কেউ সেই দেয়াল ভাঙবার জন্য দিনরাত চেষ্টা করতে লাগল। যতই বাইরের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে লাগল, ততই সেনাপতি কুলের ভিতরে নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিল। এমনিভাবে এল সেনাপতির ছেলেকেই সেনাপতি করার প্রথা। সেনাপতির ক্ষমতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গেরও ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ল। ফলে প্রত্যেক কুলের ভিতর দেখা দিল একদল শাসক-শ্রেণী। আগের সেই স্বেচ্ছায় শাসনের কাল আর রইল না। এক এক দল শাসক এখন নিজেদের খেয়াল মত দেশ শাসন করা শুরু করল।

মানুষের যতদিন জ্ঞানধারণা কম ছিল, ততদিন মানুষ চারপাশের সব-কিছুকেই ভোজবাজী বলে মনে করত। প্রত্যেক পাথরে, গাছে ভূত প্রেত আছে মনে করে সে চমকে যেত। যখন মানুষ চারপাশের জগতকে বুঝতে শিখল তখন ধীরে ধীরে তার ধারণা বদলাতে লাগল। দেবতার উপর মানুষের বিশ্বাস লাগল কমতে। সাধারণ লোক বেশ বুঝছিল যে দেবতার নাম ক'রে যতই কেন বলা হ'ক না, সমাজে সত্যিকারের সাম্য আর ছিল না। পুরোহিতরা এসে জনসাধারণ আর শাসকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁরাই যেন দেবতাদের প্রতিনিধি! তাঁরা বললেন যে, সমাজ যেমন আছে তা দেবতাদের ইচ্ছেতেই অমন হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কথা বলা অন্যায়। এমনিভাবেই ক্রমে রাজা আর পুরোহিতের মধ্যে একজোট ভাব দেখা দিল। তাদের কাজ হ'ল গরীবদের হয় ভুলিয়ে নয় জোর ক'রে শাসন করা।

সভ্যতার আরম্ভ

বর্ব্বর সমাজের শেষে মানুষের যে অবস্থা ছিল, তাকেই সভ্যতার গোড়া বলা হল। সভ্য বলতে কিন্তু সদাশয়, পরোপকারী এসব কিছু মনে কর না। বর্ব্বর সমাজেরই শেষের দিকে মানুষে মানুষে তফাৎ হয়েছিল। গরীব, বড়লোক, দাস আরও কত কি। একজন আর একজনকে শোষণ করে, লুঠতরাজ ক'রে তবেই তারা সভ্যসমাজে উঠেছিল। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের পিছনে আছে একদল শোষিত, নিপীড়িত, দীনদুঃখীর করুণ কাহিনী।

মিশরের মন্দিরের গায় যে কত এ রকম করুণ ছবি আছে তার লেখাজোখা নেই। একটি ছবিতে, এক লম্বা বন্দীর সারি দালান গাঁথবার জন্য ইট তৈরী করছে। একজনের ঘাড়ে ইট বোঝাই বাক্স; সে দুই হাতে তা ধরে আছে। আর একজন জল আনবার মত বাঁকে করে ইট বইছে। রাজমিস্ত্রীরা দেয়াল

গাঁথছে আর একজন বাবু তাই তদারক করছেন মস্ত ইটের উপর বসে। হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে তদারক করাই তাঁর কাজ। আরও একজন বাবু তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে ক্রীতদাসদের মাথায় বেদম মারছেন।

আগের সব সমাজ থেকে এই সমাজ হল সম্পূর্ণ আলাদা। 'শ্রমবিভাগ' হবার ফলে এখন এক একটি পরিবার বিশেষ বিশেষ জিনিস বানায়। যে সব জিনিস তৈরী হচ্ছে তা বিক্রী করাও সমস্যা! টাকা পয়সা না থাকলে লেনদেন হবে কেমন ক'রে? তাই যে সব ধাতু পাওয়া যেত তা দিয়েই কোনও রকমে লোক টাকা পয়সার কাজ চালাত। একবার টাকা পয়সা তৈরী হয়ে গেলেই ব্যবসা বেশ জমে উঠত।

দেখতে দেখতে একদল ব্যবসায়ী গজিয়ে উঠল সমাজের মধ্যে। ব্যবসাদারেরা কিন্তু নিজেরা কোনও দরকারী কাজ করে না। সংসারের কোনও জিনিসই তারা নিজের হাতে তৈরী করত না; শুধু একজনের জিনিস কিনে নিয়ে আর একজনকে বিক্রী করাই তাদের কাজ। কাউকে কম দাম দিয়ে কিনে নিয়ে সেটাই বেশী দামে বিক্রী করার নাম ব্যবসা। যারা জিনিস তৈরী করে, ব্যবসায়ী গোড়াতেই তাদের ভরসা দেয় যে তার তৈরী সব জিনিসই সে কিনে নেবে। এমনি করে প্রত্যেক কারিকরকে তারা নিজেদের অধীনে আনে।

ব্যবসায়ীরা ক্রমে ক্রমে দেশের বেশীর ভাগ টাকা পয়সারই মালিক হ'ল। জিনিসপত্তর বিক্রী করে টাকা পাবার পরে লোক টাকা পয়সার মহিমা বুঝতে পারল। তখন গরীবরা সেইসব মহাজনদের হাত পা ধরে টাকা পয়সা ধার করত। দেখতে দেখতে টাকা পয়সা ধার দিয়ে সুদ আদায় করাই এক নতুন আয়ের উপায় হয়ে দাঁড়াল। মহাজনদের কাছ থেকে যে একবার টাকা ধার নেবে, তার আর রেহাই নেই। বড়লোকের অত্যাচারে তার জীবন বিষময় হয়ে উঠত। কিন্তু দেশের রাজত্ব বড়লোকদের হাতে বলে তারা সব সময় মহাজনদের দিকেই রায় দিত।

টাকা, পয়সা, দাসদাসী, জিনিসপত্তরের সঙ্গে সঙ্গে জমীজমাও মানুষের নিজের নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে দাঁড়িয়ে গেল। আগের মত জমীর জন্য 'জন' কিংবা 'কুলের' কাছে জবাবদিহি করতে হ'ত না। তোমরা হয়তো ভাবছ যে জমী তো নিজের হওয়াই ভাল। যেমন খুসী তেমন চাষ করব যেমন ইচ্ছে তেমন ফসল ফলাবো। কিন্তু যারা গরীব তারা কি করবে? তারা তো টাকা খরচ করে সব সময় ভাল ভাল জিনিস লাগাতে পারবে না। তাদের তখন বাধ্য হ'য়ে মহাজনের কাছে জমী বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করে খরচ চালাতে হবে। একবার মহাজনের হাতে গেলে কি রক্ষা আছে? ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন দিয়ে তবে সে ছাড়বে।

দেখতে দেখতে কয়েকজন বড়লোক সমাজে অসীম ক্ষমতাশালী হয়ে পড়ল। তাদের কিন্তু টাকা-পয়সা ধনদৌলত বাড়বার মূলে রয়েছে সমাজের বেশীরভাগ গরীবদের খাটনি। যারাই একটু পয়সা করল তারাই তখন বেশী দাসদাসী রাখতে লাগল। যত দাসদাসী থাকবে ততই তো তাদের খাটিয়ে আরও বেশী পয়সা রোজগার করা যাবে কি না! লোকে তখন মানুষকে জোর ক'রে ধরে এনে অন্য সব জিনিসপত্তরের মত হাটে-বাজারে বিক্রী করত। এখন তুমি যেমন তরিতরকারী কিনতে বাজারে যাও, তখন তেমনি ক্রীতদাস কিনতে বাজারে যেতে। সে বাজারে হয়ত কত রকমের মানুষ দেখতে; তোমার যাকে পছন্দ হ'ল তাকে কিনে নিয়ে এলে। একবার কেনা হয়ে গেলে সে তোমারই সম্পত্তি হয়ে গেল। তার আর মুক্তি নেই।

এক প্রভু মরে গেলেও সে তার ছেলের সম্পত্তি হ'ত। সমাজে তার কোনও স্থান ছিল না; এমন কি সে প্রভুদের সামনে কথাও উচ্চারণ করতে পারত না। আকার ইঙ্গিতে তার মনের ভাব বোঝাতে হ'ত। প্রভুর সামনে কথা বলা নাকি ভয়ানক গর্হিত।

কোন অনাদি কাল থেকে শুরু হলেও পৃথিবীতে দাস-প্রথা সেদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ভারতও তা থেকে বাদ যায় নি।

সভ্য-সমাজে পরিবারের মধ্যে পুরুষই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা! সমাজে তখন

থেকেই এক বিবাহ-প্রথা বহু জায়গায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু এশিয়াতে এ নিয়ম খাটেনি। হিন্দু, ইরাণী, চীনা সব দেশেই পুরুষের বহুবিবাহের প্রথা দেখা যায়। গল্পে উপকথায় সব ব্যাপারেই শুরু হয়:

"এক যে ছিল রাজা—তার ছিল সাত রাণী!"

কৃষ্ণ, দশরথ সব আদর্শ পুরুষেরই বহু বিয়ে। কেবল রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে একটু তফাৎ দেখা যায়।

ইতিহাসের গল্প

(দ্বিতীয় খণ্ড)

জ্ঞানবৃদ্ধ মিশর

আফ্রিকা মহাদেশের ম্যাপ খুললে দেখতে পাবে যে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি বড় নদ প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে। তার নাম 'নীল' (Nile)। সমুদ্রে মিশবার সময় যে দেশের মধ্য দিয়ে নদটি প্রবাহিত হয়েছে তারই নাম মিশর।

মানুষ চিরকালই খাবারের লোভে দেশ বিদেশে বেড়িয়েছে। যেখানেই কিছু না কিছু খাবারের সন্ধান পেয়েছে সেখানেই মানুষ গিয়ে আস্তানা গেড়েছে! নীল নদের উপত্যকার জমী খুব উর্ব্বর। প্রত্যেক বৎসর নিয়মিত ভাবে নীল নদের দুই কুল ছাপিয়ে বন্যা হয়। চারদিকে তাকালে তখন জল আর জল, কেবল জলই চোখে পড়ে। কোথাও যেন স্থলের চিহ্নও নেই। তারপরে যখন সেই জল শুকিয়ে যায় সেখানে পড়ে থাকে মস্ত পুরু পলিমাটির সর। পলিমাটিতে ফসল হয় সব চেয়ে ভাল, সেইজন্যে প্রত্যেক বৎসর বন্যার পরে সে দেশের লোকদের আনন্দ দেখে কে!

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, যাকে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি "সাহারা" বলি চিরদিন সেটা মরুভূমি ছিল না। বরফের যুগের আমলে সাহারা ছিল

ফলমূলে ভরা চমৎকার শস্য-শ্যামল মাঠ। সেই অঞ্চলের মানুষই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম ফলমূল সঞ্চয় আর শিকার করা ছেড়ে নীল নদের তীরে এসে চাষবাস আরম্ভ করেছিল। সাহারা অঞ্চলে অনেক জংলা যব গাছ হ'ত, সে সব যব খেয়েই ওদেশের লোক বাঁচত।

নীল নদের অঞ্চলে বৃষ্টি নেই। কিন্তু বৃষ্টি না থাকলেও নদীর বন্যার জল মানুষ জমিয়ে রাখত। সেইসব জল আবার খাল কেটে এদিক সেদিক নানা ক্ষেতে আর বাগানে আনবার বন্দোবস্ত করা হ'ত। এই ভাবে জলসেচন করে চাষবাস মিশরেই প্রথম আবিষ্কার হয়।
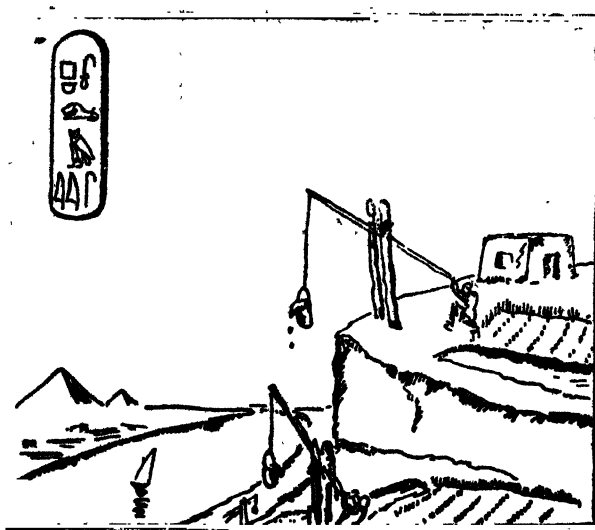
মিশরের উপত্যকা

মিশরের লোকরাই ঋতু পরিবর্ত্তনের জ্ঞান বের করে। সেকালের লোক মোটেই জানত না যে গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, তারপর হেমন্ত, শীত, বসন্ত এত সব ভিন্ন ভিন্ন ঋতু আছে। নীল নদের দেশের লোকরা দেখত যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়েই নদীতে বান ডাকে। যখন চারদিকে গরমের চোটে আগুন জলছে, ক্ষেত খামার পুড়ে যাচ্ছে তখন থেকেই চাষীরা প্লাবনের আশায় বসে থাকত। তাদের সব সময়েই ভয় হ'ত যদি এবার প্লাবন না হয়! তাই তারা নদী-দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানা উপচার নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে পূজা

দিত। সেকালের পুরোহিতরাই নদীর প্লাবন বিশেষ করে লক্ষ্য করতেন বলে লোক তাদেরই কাছে যেত ভরসা নিতে যে এবারও প্লাবন সত্যি সত্যি হবে কি না। এখনো মিশরের সব মন্দিরের গায় বন্যার স্ফীতি মাপবার বহু দাগ রয়েছে। এক প্লাবন থেকে আর এক প্লাবন আসার সময়কে তারা এক বৎসর বলত।

আরও আগের যুগের মানুষকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ ষোল সতেরো ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হ'ত খাবারের খোঁজে! কিন্তু মিশরে বন্যার সাহায্যে চাষবাস সহজ হওয়ায় লোক একটু অবসর সময় পেল। চাষবাসের ফলে মানুষ জংলী অবস্থা ছেড়ে বর্ব্বর অবস্থায় পৌছেছিল। তখন আর মানুষে মানুষে সাম্য ছিল না। নানা জন্তুর নামে তখন চল্লিশটি টুকরো টুকরো 'কুলে' মিশর বিভক্ত ছিল।

হাতে একটু অবসর পাওয়ায় মিশরের চাষীরা নানা রকম প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। আকাশে এত অগণিত ফুলের মত কি সব দেখা যায়? সেগুলো কেমন করে সেখানে গেল? নীল নদেই বা নিয়ম করে কেন বন্যা হয়? এই সব নানা প্রশ্ন তাদের মনে উঁকিঝুঁকি মারত।

কুলের মধ্যের একদল বুদ্ধিমান লোক যথাসাধ্য এইসব অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিত। তাদেরই মিশরের লোক বলত 'পুরোহিত'। কুলের সবাই তাদের সম্মান করত। তারা যতই মাথা খাটিয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দিতে আরম্ভ করল কুলের লোকরাও ততই তাদের সর্ব্বজ্ঞ ব'লে মনে করতে লাগল।

পুরোহিতরা লক্ষ্য করে দেখল যে, নীল নদের প্লাবনের সময় একটি নক্ষত্র আকাশে যে জায়গায় থাকে তারপরে ক্রমে ক্রমে আর সে ঐ জায়গায় থাকে না, অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে যখন বন্যার সময় আসে তখন তাকে ঠিক আবার যথাস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এই নক্ষত্রটির নাম 'লুব্ধক'। লুব্ধক নক্ষত্রের উদয় আর অস্তের সময়কে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে তারা সৌরবর্ষের হিসাব বের করেন।

যতই দিন যেতে থাকে ততই বর্ব্বর অবস্থার শেষের দিকে মিশরের কয়েকটি কুল মিলিয়ে এক বেরাদরী বা (Phratry) গঠিত হয়। এবং অবশেষে মিশরের টুকরো টুকরো চল্লিশটি কুল মিলে একটি সংঘ

গঠিত হ'ল। কালক্রমে তা পরিণত হয় এক রাজার রাজত্বে। রাজা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হ'ল শাসকশ্রেণী। আমাদের দেশে যাদের ক্ষত্রিয় বলা হয় এরা তাদেরই মতন। মিশরের রাজার উপাধি হ'ল ফেয়ারো (Pharaoh)। ফেয়ারো কথার মানে হচ্ছে "যে বড় বাড়ীতে থাকে"।

সমাজে গরীব আর বড়লোক থাকার ফলে শাসকশ্রেণীকে সব সময় সাবধান থাকতে হ'ত, যেন কেউ বিদ্রোহ না করে। যারা গরীব, তাদের কি ভাবে ভুলিয়ে রাখা যায় তার চেষ্টায় রাজা আর পুরোহিতরা তখন এক হ'য়ে গেল। সমাজের সবাইকে পুরোহিতরা বোঝাল যে রাজা হচ্ছেন দেবতার অংশ। কাজেই তিনি সমাজের সকলেরই ভাল করেন। পুরোহিতরা সমাজের গরীবদের আরও বোঝাল যে পৃথিবীর সুখই বড় কথা নয়। পরকালের সুখই সত্যিকারের সুখ। এ জীবনে যে যত কষ্ট করবে পরের জন্মে সে ততই সুখী হবে।

এইভাবে পুরোহিত ও শাসকশ্রেণী দু'দল মিলে সমাজের গরীবদের শোষণ করত। তখনকার মিশরদেশে এ দুই শ্রেণী বাদে বেশীর ভাগ লোকই ছিল ক্রীতদাস। প্রজার কাছ থেকে রাজা জোর করে শস্য আদায় করতেন।

অনেক প্রাচীন ছবিতে দেখা যায় যে চাষীরা শস্য এনে বড়লোকদের ভাঁড়ারে জমা করে দিচ্ছে, চাবুকের তাড়নায় নৌকা তৈরী করছে, খাজনা না দেওয়ার অপরাধে প্রভুর কাছে মার খাচ্ছে! রাজা আর পুরোহিতদের অত্যাচার এত অসহনীয় ছিল যে অনেকে দিনে দু'মুঠো খেতেও পেত না। তাদের আগেরই মত জংলা জমীর শেকড় বাকড় খেয়ে প্রাণধারণ করতে হ'ত।

পুরোহিতদের এক অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, কেউ মরে গেলে তার নিজের শরীর না হ'লে তার আত্মা স্বর্গরাজ্যের দেবতা 'ওসিরিসের' কাছে যেতে পারে না। সেজন্য কেউ মরে গেলেই তার শরীর একরকম ঔষধ দিয়ে লেপে দেওয়া হ'ত। এই প্রলেপের নাম পারস্য ভাষায় 'মুমী'। তা থেকেই ঐ প্রলেপ মাখা শরীরের নাম হয় 'মামী'। তারপর বিরাট লম্বা কাপড়ে সারা শরীর আবৃত করে তাকে কবরে নিয়ে যাওয়া হ'ত। কবর না বলে তাকে আর

একটি বাড়ী বলাও চলে। কারণ সেই কবরে মজুত করা থাকত যত রকমের আসবাব পত্র, সাজ-সরঞ্জাম, গানের যন্ত্রপাতি, ঠাকুর, চাকর, মিস্ত্রী, মুচি সব রকমের পুতুল। বেঁচে থাকবার সময় যারা ছিল সঙ্গী, মরে গেলে তাদের পুতুল পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত কবরে!

অনেক আগে পাহাড়ের গায় এইসব কবর খোঁড়া হ'ত। কিন্তু মিশরীয়রা ক্রমে উত্তরে চলে আসতে থাকে। তখন কেউ মারা গেলে তাকে মরুভূমির ভিতরেই কবর দিতে হ'ত। কবর দেবার কয়েকদিনের মধ্যেই চারদিকের জন্তু জানোয়ার সেই সব কবর খুঁড়ে মড়ার শরীর টেনে বের করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেত। জীবজন্তুরা যাতে মড়ার শরীর বের করে ফেলতে না পারে সে জন্যে মিশরীয়রা প্রত্যেক কবরের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত। যারা বড়লোক তারা অনেক ক্রীতদাস দিয়ে বড় বড় পাথর এনে কবরের উপর চাপা দিত। যে যত বড় লোক তার কবর হ'ত তত উঁচু। সেই সব পাথরে নানা রকম কারিকুরিও করা হ'ত। এগুলোই হচ্ছে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য্যের অন্তত্তম আশ্চর্য্য মিশরের "পিরামিড!"

মিশরের ভাষায় 'উঁচুকে' 'পির-এম উস' বলে। তাথেকেই উঁচু জিনিষ বোঝাতে পিরামিড শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

কিন্তু মিশরের পিরামিড হ'ত কি করে জানো? শোন তা হলে। দেশের হাজার হাজার লোককে বেগার খেটে দিতে হ'ত রাজার পিরামিড তৈরী করবার জন্যে। সমস্ত পিরামিডের মধ্যে রাজা 'খুফু'র (Khufu) পিরামিডই সবচেয়ে উঁচু। নিজের সমাধি মন্দির গড়বার জন্যে তিনি তিরিশবছর ধরে হাজার হাজার লোককে বেগার খাটিয়েছিলেন। বড় বড় পাথর ঘাড়ে করে বয়ে আনতে হ'ত তাদের। একটু যদি গাফিলতী হ'ত তো অমনি সপাং করে চাবুক পড়ত পিঠে। হাজার হাজার লোকের গায়ের ঘাম আর চোখের জলে নির্ম্মিত হয় পিরামিড।

সব রাজাই কিন্তু খুফুর মত অত্যাচারী ছিলেন না। কখনো কখনো খুব ভাল রাজাও মিশরে ছিলেন। তিনি হয়তো নিজের সন্তানের মত প্রজা

পালন করতেন। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে হেন্থু নামে এমনি একজন সদাশীল রাজা ছিলেন মিশরে। অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। প্রাচীন লেখা থেকে দেখা যায় যে অনাথদের তিনিই ছিলেন আশ্রয়! গরীবদের মধ্যে বেছে বেছে ভাল লোকদের রাজদরবারে কাজও দিতেন।

কিন্তু হেন্থুর মত রাজা তো ছিলেন না সকলে। কাজেই তাঁদের আমলে গরীবদের দুঃখের শেষ থাকত না। যখন দুঃখ কষ্ট একেবারে অসহ্য হয়ে উঠত তখন বাধ্য হয়ে প্রজারা বিদ্রোহ করত। পণ্ডিত ডেলক্রইক একটি লিপিতে দেখেছেন যে একবার ক্রীতদাসরা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহীরা রাজার গদী পর্য্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিল। প্রায় তিনশো বছর ধরে সেই বিদ্রোহীদের রাজত্ব চলেছিল মিশরে।

কিন্তু যখনই গরীবরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চাইত তখনি পুরোহিতরা তাদের সম্পর্কে নানা কুৎসা রটনা করে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করত।

অনেক কষ্টে বহুদিনের চেষ্টার পর দক্ষিণ দেশ থীবসদের সামন্তরা পুরোহিতদের সাহায্যে সে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেছিল। তখন থেকেই থীবস্ প্রদেশের সামন্তরা মিশরের গদীতে বসে। মিশরের গরীব ক্রীতদাসরা কিন্তু খুব বেশীদিন থীবসের সামন্তদের অধীনে শান্তিতে বসবাস করতে পারে নি। প্রায় সাতশো বছর পরে আবার তাদের বিদ্রোহ করতে হয়েছিল। এই সময় বিদেশ থেকে হিক্শাস্ জাতি এসে মিশর দখল করে নেয়। মিশরের লোকরা হিক্শাস্দের ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ হিব্রুদের দুচোখে দেখতে পারত না। তাই যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ১৭০০ বছর আগে আবার মিশরের লোক হিক্শাসদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এবারও থীবসের সামন্তরা হিক্শাস্দের তাড়িয়ে মিশর দখল করে। তারা তখন বিশাল সৈন্য বাহিনী গড়ে তুলে রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করে। দেখতে দেখতে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপিত হ'ল। তৃতীয় থুটমসিস্ এঁদের মধ্যে সব চেয়ে বড় দিগ্বিজয়ী সম্রাট বলে খ্যাত।

রাজারাজড়ার যতই না কেন পরিবর্তন হ'ক—দেশের গরীবদের উপরে শোষণ ব্যবস্থা একটুও কমেনি তখনো। একদিকে রাজা অন্যদিকে পুরোহিত এদের দুজনেরই শোষণ সমানে চলছিল। কে বড় তাই নিয়ে রাজা আর পুরোহিতদের মধ্যেই অবশেষে লড়াই বাধল। সম্রাট ইখনাটন্ পুরোহিতদের ধ্বংস করবার জন্য এক নতুন ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান পুরোহিতরা প্রজাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহ করায়। তাতে রাজাই পরাজিত হয়েছিলেন। এবং শেষ ফেরারোগণ পুরোহিতদের কথামত চলতেন। আমাদের দেশেও এমনি ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে মাঝে মাঝেই যুদ্ধ হ'ত। এমনিভাবে চলার প্রায় হাজার বছর পরে আসিরীয় জাতি পশ্চিম এসিয়া জয় করে মিশরও দখল করেছিল। মিশর তখন সার্ডানোপোলিস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খ্রীষ্টের জন্মের সাতশো বছর আগে মিশর আবার স্বাধীন হয়েছিল। তখন নীল নদের বদ্বীপে 'সেইস' দেশের রাজা মিশর শাসন করতেন। কিন্তু সে স্বাধীনতাও খুব বেশী দিন টিকতে পারে নি। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশো বছর আগে পারস্যের সম্রাট ক্যামবিশেস্ আবার মিশর জয় করেছিলেন।

তারপরে দারুণ উল্কার মত আলেকজাণ্ডার দেশের পর দেশ জয় করতে করতে যখন পারস্য বিজয় করে নিলেন, তখন মিশর হল ম্যাসিডোনীয়ার অন্তর্ভুক্ত। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁরই এক সেনাপতি মিশরে গিয়ে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। তাতে হঠাৎ মনে হ'ত যে মিশর বোধ হয় আবার স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তা নয়। বিদেশী শত্রু কখনই কারুর দেশকে স্বাধীন করতে পারে না।

অবশেষে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চল্লিশ বছর আগে রোমকরা মিশর জয় করতে আসে। মিশর সাম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। রোমক সেনাপতিরা মিশর জয় করতে এসে তাঁর ছলনায় আবদ্ধ হয়ে পড়তেন। মিশর জয় করা আর তাঁদের হ'ত না। অবশেষে অগাস্টাস নামে একজন রোমক সম্রাট ক্লিওপেট্রার ছলনায় আবদ্ধ না হয়ে মিশর জয় করেন।

তাঁর ইচ্ছা ছিল মহারাণী ক্লিওপেট্রাকে বন্দী করে রোম নগরীর রাজপথে বিজয় গর্ব্বে প্রদর্শন করবেন। সে মতলব টের পেয়ে মহারাণী ক্লিওপেট্রা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। মিশর রোমক সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে পড়ল।

সেই যে মিশরের গৌরব সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে তা আর উঠেনি আজ পর্য্যন্ত।

কিন্তু মানব সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখবে সভ্যতার বহু জিনিসই আমরা পেয়েছি মিশরের কাছ থেকে। সাহিত্য ও শিল্পকলার সৃষ্টি সেখানে। ছবি আঁকা, মন্দির নির্ম্মান, সবই মিশরে আরম্ভ হয়। ভাস্কর্য্যেরও আরম্ভ মিশরে। জ্যোতির্ব্বিদ্যাও বোধহয় সেখানেই প্রথম প্রচলিত হয়।

মিশর যখন রোমক সাম্রাজ্যের অধীন হ'ল তার কিছু পরেই খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-প্রচার শুরু হয়েছিল। রোম কিংবা ইওরোপের অন্যান্য দেশ যখন কেউ খ্রীষ্টান হয়নি তখনই মিশর খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা নেয়। ফলে রোমের শাসক শ্রেণী মিশরের বিধর্ম্মী খ্রীষ্টানদের উপর করত অন্যায় অত্যাচার। মিশরের খ্রীষ্টানরা তাদের ভয়ে মরুভূমির ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকত। ধূ ধূ মরুভূমির ভিতর বাইরের লোকের চোখের আড়ালে বানানো হ'ত খ্রীষ্টানদের নানা মঠ।

ইতিহাসের রথ তো স্থির বসে থাকেনা কিনা। রোমকরাই কালক্রমে খ্রীষ্টান হ'ল। তখন এল মিশরের খ্রীষ্টানদের সুদিন। তারা এবার অন্যদের উপর অত্যাচার শুরু করে নিজেদের দুঃখের কঠোর প্রতিশোধ নেয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম হ'ল রাজধর্ম্ম। মিশরের অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর খ্রীষ্টানদের অত্যাচার খুব বেড়ে যাওয়ায়, সকলে রাজার হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিল।

দেশের ভিতরের অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবের বিজয়ী মুস্লিম সৈন্য অনায়াসে মিশর দখল করে নেয়। মিশর হ'ল এবার বাগদাদের খলিফার সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ। আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি এত শীগ্‌গীর মিশরে প্রচলিত হ'ল যে দেখতে দেখতে মিশরের প্রাচীন ভাষা ও রীতিনীতি সব গেল বদলে।

প্রায় দুশো বছর পরে খলিফার ক্ষমতা কমে যায়। তখন মিশরের তুর্কী শাসনকর্ত্তারা নিজেদের স্বাধীন বলে জাহির করে। তার তিনশো

বছর পরে ক্রুজেডের মুস্লিমবীর সালাদিন মিশরের সুলতান হন। তাঁর বংশধরের মধ্যে একজন তুরস্ক থেকে বহুসংখ্যক ক্রীতদাস মিশরে নিয়ে আসেন। এদের বলা হ'ত ম্যামলিউক (Mameleuke) বা ক্রীতদাস। এত শ্বেতকায় ক্রীতদাস আনবার উদ্দেশ্য ছিল শুধু লড়াই করা। কিন্তু কিছু কাল পরেই দুর্ধর্ষ ম্যামলিউকরা নিজেরাই বিদ্রোহ করে রাজসিংহাসন দখল করেছিল। তখন থেকে প্রায় পাঁচশো বছর পর্য্যন্ত এদের রাজত্ব চলেছিল মিশরে। ম্যামলিউকরা নিজেদের দেশের লোক ছাড়া মিশরের কাউকে তাদের দলে নিতে চাইত না।

এমনি ভাবে একটানা চলে প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। তারপর তুরস্কের অটোমান সুলতান মিশর দখল করে নেন। মিশর এবার তুরস্কের অধীনে এল। তুর্কী শাসনের সময় ম্যামলিউকদের সুলতানকে ফাঁসী দেওয়া হয়। অন্য ম্যামলিউকদের উপর কিন্তু কোন অত্যাচার হয়নি। তখনো তাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল সমস্ত মিশরে।

আরও পরে তুরস্কের ক্ষমতা কমে গেলে ম্যামলিউকরা প্রায় স্বাধীন ভাবেই মিশরে চলাফেরা করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে নেপোলিয়ন মিশরে এসে ম্যামলিউকদের পরাজিত করেছিলেন।

এবার আমরা চলে এসেছি উনবিংশ শতাব্দীতে। মিশরের রাজার উপাধি ছিল খেদিভ্ (Khedive)। তখন মেহেদ আলি মিশরের খেদিভ্। তিনি আধুনিক মিশর গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ম্যামলিউকদের ক্ষমতা ধ্বংস করে, এমন কি ইংরাজদেরও তিনি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন। মিশরের বাসিন্দা চাষীদের ভিতর থেকেই তিনি এক বিজয়ী সেনাবাহিনী গড়েন। তাঁরই আমলে মিশরে প্রথম তুলার চাষ হয়। ৮০ বছর বয়সে ১৮৪৯ সালে মেহেদ আলির মৃত্যু হয়।

তাঁর বংশধরেরা সকলেই ছিল অকর্ম্মণ্য। ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা তখন মিশর গ্রাস করার জন্য পাগল। নীল নদের দুপাশের শস্য শ্যামলা মাঠ দেখে তাদের লোভ সামলান হ'ল কঠিন। ইংরাজ ও ফরাসী বণিকরা

গোপনে মিশরের খেদিভকে টাকা ধার দিয়ে বিলাস ব্যসনের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। টাকা ধার দেবার সময় যেন তাদের বিনয়ের অবতার মনে হ'ত। সুদ আদায়ের সময় কিন্তু আর সে রূপ থাকতনা। যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে নীলনদের মুখে দাঁড়িয়ে তারা গায়ের জোরে সুদ আদায় করত।

সে সময় ১৮৬৯ খ্রীঃ লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করে সুয়েজ খাল কাটা হয়। তোমরা কি জানো, যে এই দুই সমুদ্র জুড়ে খ্রীষ্টের জন্মের ১৪০০ বছর আগে ঠিক এমনি আর একটি খাল কাটা হয়েছিল?

সুয়েজ খাল কাটা হওয়ায় ইংরাজ ও ফরাসীদের কাছে মিশরের উপর আধিপত্য করা আরও প্রয়োজন হ'ল। কায়দা করে ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী সুয়েজ খালের বেশীর ভাগ অংশই মিশরের খেদিভের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। বাকী অংশ নেয় ফরাসীরা। ইংরাজরা ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড দিয়ে খালের অংশ কিনেছিল। কিন্তু এক ১৯৩২ সালেই তারা লাভ করেছিল ৩,৫০০,০০০ পাউণ্ড। এখন প্রায় তেরো টাকায় এক পাউণ্ড হয়, তবেই বুঝে দেখ যে কি ভীষণ লাভের ব্যবসা হচ্ছে সুয়েজ খালের অংশগুলি!

সুয়েজ দখলে আনবার জন্য ইংরাজরা ক্রমাগত মিশরের শাসন কাজে ব্যাঘাত জন্মাতে লাগল। তখন আরবীপাশা নামে একজন সৈনিক মিশরের সকলের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন সামান্য মজুরের ঘরে; কিন্তু নিজের চেষ্টাতে হয়েছিলেন মিশরের দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী। তিনি ইংরাজদের কথা না মানায় ইংরাজরা মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সে দেশ জয় করে নিয়েছিল।

এই ভাবে শুরু হ'ল মিশরে বৃটিশ রাজত্ব। ইংরাজদের সৌভাগ্যে তখন ফরাসীদের হ'ল ভীষণ হিংসে। তারাও ইংরাজের কাছ থেকে অনেক সুবিধা আদায় করে নিল।

মিশরীয়রা কিন্তু নীরবে বৃটিশ শাসন মেনে নেয় নি। জগলুল পাশার নেতৃত্বে তারা স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে যায়। এমনি করে এসে পড়ে প্রথম বিশ্বব্যাপী মহাসমর ১৯১৪ সালে।

আমাদের ভারতবর্ষের মত মিশরের জমিদার শ্রেণী স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিতে চায়নি। ইংরাজরাও তাদের লোভ দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে রেখে ছিল। ইংরাজরা খ্রীষ্টান আর মুস্লিমদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে দেয়। যুদ্ধের পর মিশরীয়দের আন্দোলনে বাধ্য হয়ে ইংরাজরা কতগুলো সুবিধা দিয়েছিল। কিন্তু তাকে স্বাধীনতা বলে না। আজও মিশর নামে স্বাধীন হলেও কার্য্যতঃ ইংরাজেরই অধীন। জগ্‌লুল পাশার দলকে বলা হয় ওয়াফ্‌দ্‌।

যতবারই মিশরের শাসন সভায় নির্ব্বাচন হয়েছে ততবারই ওয়াফ্‌দ্‌ দল সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়ে নির্ব্বাচিত হয়েছে। আর ওয়াফ্‌দ্‌দের চাইতো না বলে ততবারই ইংরাজরা সভা ভেঙে দিয়েছে। ১৯২৭ সালে জগ্‌লুল পাশার মৃত্যু হয়। তাঁর উপযুক্ত শিষ্যরা এখনও জগলুলের স্বপ্ন সফল করবার জন্য সংগ্রাম করছেন।

স্বর্গরাজ্য মেসোপোটেমিয়া

মিশরের সবচেয়ে উঁচু পিরামিডের চূড়ায় উঠে মন কর তুমি হাজার মাইল দূরের জিনিষও দেখতে পাচ্ছ। তাহলে দেখবে দূরে, বহুদূরে, পাটকিলে মরুভূমির ঢেউখেলানো বালুর রাজ্যের ওপাড়ে চকচকে সবুজ মখমলের মত যেন কি! ওটা আর কিছুই নয়। দুটো নদীর মাঝের ছোট্ট উপত্যকা! পুরানো খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে একে বলা হয় স্বর্গরাজ্য। কেমন যে রহস্যে ঘেরা রয়েছে এই দেশ তা কেউ বলতে পারে না। গ্রীকদেশীয়রা এদেশের নাম দেয়- মেসোপোটেমিয়া—মানে দুটো নদীর মধ্যের দেশ। এর আর এক নাম ইরাক।

নদী দুটোর নাম হচ্ছে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস। এশিয়া মাইনরের ম্যাপ- খুললেই দেখতে পাবে আর্ম্মেনীয়ার পাহাড়ের গা থেকে জন্মে নানা দিকে এঁকে বেঁকে এরা পারস্য উপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

নীল নদের উপত্যকায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে লোক এসে জড়ো হয়েছিল খাবারের খোঁজে, এখানেও তেমনি দেখতে দেখতে লোক জনের

বসতি গড়ে উঠল। এদেশের উপর লোভ ছিল চারপাশের সকলের। তাই দিনরাত নানা বিভিন্ন কুলের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত।

কয়েক হাজার বছর আগে এই দেশের সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে 'সুমের' জাতির বসবাস ছিল। তারা ছিল শ্বেতকায়, আর থাকত পাহাড়ে পাহাড়ে। মেসোপোটেমিয়ার সমভূমিতে নামবার আগে থাকতেই তাদের মধ্যে পুজা অর্চ্চনার প্রচলন ছিল। পাহাড়ের গায় হ'ত তাদের বেদী। নীচের সমভূমিতে এসে তারা আর আগের মত উঁচু পাহাড় পেলনা। তখন সবাই মিলে মাটী ঢালাই করে বড় বড় পাহাড়ের মত টিলা তৈরী করে তার উপর মন্দির বসাল। সিঁড়ি কেমন করে করতে হয় তা তারা জানতনা। কাজেই সমস্ত টিলা ঘিরে ঘিরে তারা প্যাঁচানো রাস্তা বানিয়ে নিল। তোমাদের মধ্যে যারা দার্জ্জিলিং, শিলং গিয়েছ তারাই দেখে থাকবে যে পাহাড়ে উঠ্‌তে গেলে প্যাঁচানো রাস্তা না হলে চলে না। তবেই দেখ, প্রাচীন সুমেরীয়দের কাছে আমাদের যুগের এঞ্জিনীয়াররা এই বিদ্যা শিখেছে!
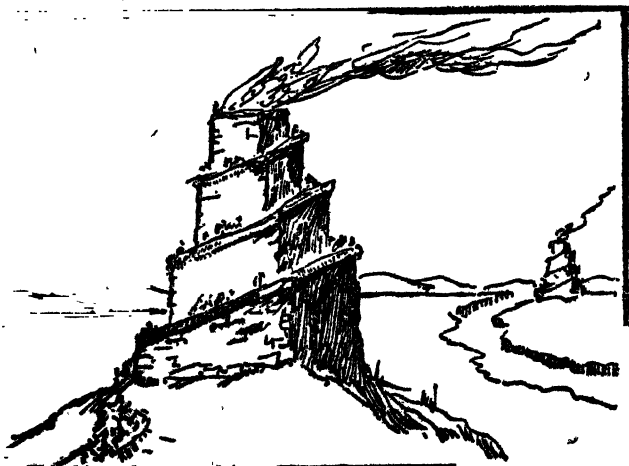
টিলা ঘিরে প্যাঁচানো রাস্তা

সুমেরীয়দের পরে আরও নানা জাতি এসে মেসোপোটেমিয়াতে বসবাস করেছিল। তারা সবাই এসে সুমেরীয়দের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেল যে তাদের কাউকে চেনবার কোন উপায় রইল না। সুমেরীয়দের কীর্ত্তি সেই সব চুউ

চূড়া এখনো এদিক সেদিক ছড়িয়ে আছে। আরও বহুদিন পরে ইহুদীরা বাবিলনে পালিয়ে মাটীর নীচ থেকে এই সমস্ত চূড়া আবিষ্কার করে। তারা এসবের নাম দিয়েছিল 'বেবেল-এরচূড়া'।

আমাদের যুগের চল্লিশ শতাব্দী আগে স্থমেরীয়রা মেসোপোটেমিয়াতে প্রথম আসে। তার পরে 'আক্কাদ' নামে আর একটি জাতি তাদের হারিয়ে দিয়ে সে দেশ দখল করে নেয়। আক্কাদরা আরব-মরুভূমিতে থাকত, আর তাদের কোনও ভিন্ন ভাষা ছিল না। স্থমেরীয় ও আক্কাদ জনপদগুলিকে প্রথম সভ্য সমাজ বলা যেতে পারে।

সে দেশে কথনো অতিবৃষ্টি আর নদীর প্লাবনে দেশময় বন্যা বয়ে যেত—আবার সে জল মরে গেলে প্রায়ই বছরের কয়েক মাস জলের টানাটানিও দেখা দিত। মানুষ আর প্রকৃতির লড়াইএর ভিতর দিয়েই সেখানে মানুষ জংলী-সমাজ থেকে বর্ব্বর সমাজের মধ্যে দিয়ে সভ্যতার কোঠায় পৌঁছেছিল। বন্যার জল আটকাবার জন্য আবিষ্কার হ'ল উঁচু বাঁধ, উঁচু জায়গায় বাড়ীঘর করা! জলের অভাব দূর করবার জন্য শুরু হ'ল বাঁধ বেঁধে জল জমা করে পরে খাল কেটে সেই জল ইতস্ততঃ সরিয়ে এনে চাষের কাজ করা। এভাবে বাঁধ বেঁধে জল কাজে লাগানোর নামই হচ্ছে 'জল সেচন'। দেখতে দেখতে স্থমেরীয় ও আক্কাদরা চাষবাসে খুব উন্নত হ'য়ে উঠল।

চাষবাস করে যতই বেশী শস্য উৎপন্ন হ'তে লাগল—সমাজের মধ্যেও ততই গরীব বড়লোকের ভেদাভেদ বাড়তে লাগল! বাঁধ বাঁধা, চাষ করা—এই সব খাটনির কাজ এসে পড়ল গরীবদের ঘাড়ে। আগে যেখানে গ্রামের সকলে একসঙ্গে একই ভাবে থাকত আর কাজ করত এখন সেখানে দেখা গেল যে, এক এক পরিবার এক এক কাজ করছে। এর পরে যে যত জমী পারল নিজের দখলে এনে নিল। ক্রমে ক্রমে ভাল জমী সবই হ'ল বড়লোকদের।

গরীবদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে, বিদেশী শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে। নিজেদের বাঁচানোর জন্য তারা ধন্না দিল ধনীর দুয়ারে। ধনীরা তখন

গরীবদের রক্ষার ভার নিজেদের হাতে নিল। এ সময়ে ব্রঞ্জের যত অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার হয়েছিল তার সবই ছিল বড়লোকদের সম্পত্তি। গরীবদের বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, যারা তাদের বিদেশীদের হাত থেকে রক্ষা করছে, তাদের ভালমন্দ সবকিছুর ভার যারা নিজেদের উপর রেখেছে—তাদের আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করা উচিত। আগের নির্ব্বাচিত নেতারা ক্রমে ক্রমে এই ভাবে নিয়মিত শোষক ও শাসকশ্রেণীতে পরিণত হ'ল।

ক্রমে এক এক কুল জুড়ে সুমেরীয় ও আক্কাদদের এক-একজন প্রধান দেখা দেয়। এইসব স্থানীয় রাজাদের বলা হ'ত 'ইসাক'। ইসাকরা প্রকৃতপক্ষে ছিল জমিদার ও পুরোহিতদের নেতা। গরীব চাষীদের কাছ থেকে এরা কর আদায় করত। প্রত্যেক চাষীকেই নিজের উৎপন্ন শস্যের একটি অংশ ইসাকদের ঘরে তুলে দিতে হ'ত। রাজস্ব আদায় করা, চাষীদের শাসনে রাখা—এইসব নানা কারণে ইসাকরা কর্ম্মচারী নিয়োগ করতে আরম্ভ করে। শুধু রাজস্ব দিয়েই চাষীদের নিস্তার ছিল না, ইসাকদের কাছে তাদের আবার নিয়মমত বেগার খেটে দিতে হ'ত। বড়লোকদের টাকাকড়ির হিসাব রাখবার জন্য একদল কেরাণীও সৃষ্টি হ'ল। সুমের দেশে শক্ত মাটীর পাতের উপর খোদা অসংখ্য হিসাবপত্র থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একথা অনুমান করেন। ইসাকদের মধ্যে অনেকে বড় বড় মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। সুমের দেশে এন্‌লিল ও আক্কাদদের শামাসা দেবীর পূজারী দুইজনও ছিলেন ইসাক। নানা কুলের মধ্যে সব সময় যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত।

পরের যুগে হয়তো কোনও প্রবল পরাক্রান্ত ইসাক নিজে সমস্ত কুলের উপর একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। রাজায় রাজায় হ'ত লড়াই—কিন্তু তার ফলভোগ করতে হ'ত গরীবদের। মিশরের মতই এখানেও পুরোহিতরা ইসাকদের সঙ্গে সব সময় একজোটে কাজ করত। তারা গরীবদের খালি বোঝাত যে ইসাকরাই দেবতার অংশ। তাদের কথা না শুনলে পাপ হবে ও পরলোকে, স্বর্গে জায়গা হবে না। একদিকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আর একদিকে অস্ত্রের জোরে ইসাকরা গরীবদের শোষণ করত।

ইসাকদের আশ্রয়ে থেকে একদল লোক ক্রমে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্যের পত্তন করে। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে যা লাভ হ'ত তার কিন্তু সবচেয়ে বড় ভাগটিই যেত ইসাকদের হাতে।

এইভাবে সে দেশে গরীব আর বড়লোকের ভেদাভেদ চলল বেড়ে। অত্যাচার অসহ্য হ'লে মাঝে মাঝে গরীবদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিত। আগে যখন সমাজের সকলে সমান সমান ছিল তখন কখনো বিদ্রোহের কথা ওঠেনি। কারণ সবাই যে সমান, কে কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, আর কেন? কিন্তু যখনই কেউ হ'ল বড়, কেউ ছোট তখন থেকেই বড়লোকরা চাইল গরীবদের আরও বেশী শোষণ করতে। যতদিন পারত গরীবরা সে অত্যাচার সহ্য করত। কিন্তু অসহ্য হয়ে উঠলে তাদের বিদ্রোহ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কার্ল মার্ক্স্ নামে একজন জার্মান মনীষী তাই বলেছেন যে সভ্য মানুষের ইতিহাসই হচ্ছে ধনী দরিদ্রের সংঘর্ষের ইতিহাস।

আক্কাদদের মধ্যে চার হাজার বছর আগে এক প্রজাবিদ্রোহ ঘটেছিল। প্রায় একশো বছর ধরে সে অরাজকতা কেউ থামাতে পারেনি।

তারপরে সেই অরাজকতার মধ্যে শাক্-কিন্ নামে একজন ইসাক সমস্ত সুমের ও আক্কাদ জয় করে সম্রাট হয়ে বসেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের গৌরবের পেছনে গরীবদের উপর অত্যাচার সমান ভাবেই চলত। এক রাজার জায়গায় আর একজন রাজা হ'লেও সেই শোষণ ব্যাপারে কোনই তারতম্য ঘটত না। যে সব গরীবরা শোষিত হ'ত, তারা দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে ধনসম্পত্তি বানাতো রাজারাজরা তাতেই ভাগ বসাবার জন্য করত অনবরত লড়াই। সে সব লড়াই-এর ইতিহাস আর গরীবদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে যে সব জিনিস তারা তৈরী করত তারই বৃত্তান্ত নিয়ে লেখা হয় সমস্ত দেশের চলতি ইতিহাস! এ ইতিহাস কখনই সত্যিকারের মানুষের ইতিহাস হ'তে পারে না!

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে আরবের আর একটি মরুবাসী জাতি "আমোরাইট্"রা আক্কাদদের হাত থেকে দেশের শাসনভার কেড়ে নেয়। এদের দখলে আসবার পর থেকে এ দেশের নাম হয়

'বাবিলন'। এখানকার রাজাদের মধ্যে হাম্মুরাবিই সবচেয়ে বিখ্যাত। হাম্মুরাবি নামের অর্থ হচ্ছে "বড় কাকা"! বেশ মজার নাম না? এঁর তৈরী ধর্ম্মশাস্ত্র পৃথিবীর খুব পুরানো ধর্ম্মশাস্ত্র। তিনি নিজেকে গরীবদের হিতৈষী বলে প্রচার করতেন। তাঁর আইনকানুন ঐতিহাসিক মহলে খুবই বিখ্যাত। তবু সেই সব আইনকানুন একটু ভাল করে ঘাঁটলে দেখতে পাবে যে তাতে সেই সময়কার বাবিলনের বড়লোক-দেরই স্বার্থ বজায় রাখা হয়েছে। তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন যে গরীবদের সহ্যের একটা সীমা আছে। সেই সীমা লঙ্ঘন করলে তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য! কাজেই তিনি জঘন্য অত্যাচার করে সে সীমা লঙ্ঘন করতে চাইতেন না। তিনি বলেন যে বাবিলনের সকলে একই জাতি ও ধর্ম্মে বিশ্বাসী বলে গরীব আর বড়লোকের ভিতরের ঝগড়া বিদ্বেষ থামিয়ে রাখা উচিত। কিন্তু তাহলেও তখন ন্যায়ের চোখে দেশের সকলে সমান ছিল না! তখনকার দিনে শাস্তি দেবার খুব সহজ উপায় ছিল চোখ উপড়ে ফেলা। হাম্মুরাবির আইনে আছে "যদি কোন গরীব কোন বড়লোকের চোখ উপড়ে ফেলে তাহলে সেই গরীবেরও চোখ উপড়ে ফেলতে হবে। আর যদি কোনও বড়লোক গরীবের চোখ উপড়ে দেয় তো তাকে কেবল রূপার এক
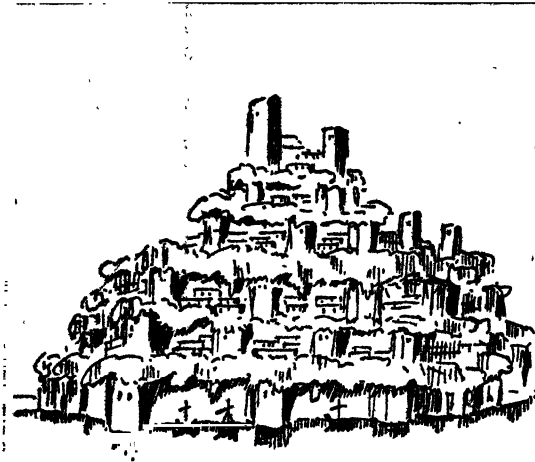
পবিত্র বাবিলন শহর

মীনা জরিমানা দিতে হবে।' তাহলেই দেখলে একই দোষে দুজনের শাস্তি হ'ল দুরকম।

হাম্মুরাবির সময়েই সমাজে ক্রীতদাস ব্যবস্থা কায়েম ছিল। ঘটি-বাটির মত সেই সব দাস বাজারে কেনা-বেচা হ'ত। কোনও ক্রীতদাসের প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে এসে বাঁচবার উপায় ছিলনা। যদি কেউ পলাতক দাসকে আশ্রয় দিত তো তাকে ভীষণ শাস্তি পেতে হ'ত। তাঁর লেখা আইন-কানুন পড়লে দেখবে যে হাম্মুরাবির কাছে ধনদৌলত সম্পত্তি জমানোই ছিল প্রথম কথা—মানুষের কথা আসত পরে।

এর প্রায় হাজার বছর পরে আর একজাতি এদেশ অধিকার করে। তাদের দেবতার নাম ছিল "আসুর"। তাথেকে সে জাতির নামকরণ হয় 'আসিরীয়'। তারা বাবিলন ও আশপাশের সমস্ত দেশ দখল করে নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। তার রাজধানী হয় 'নিনেভা'। তাদের জয়লাভের প্রধান কারণ হচ্ছে লোহার অস্ত্র ব্যবহার। লোহা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিপ্লব আসে ও যারা সবাইর আগে লোহার ব্যবহার আরম্ভ করে-ছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধে আর কেউ পেরে উঠ্‌তে পারল না। দেখতে দেখতে পারস্য থেকে মিশর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ তাদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

আসিরীয়রাও নানা জাতিকে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করতে কসুর করেনি। বিজিত দেশের কাছ থেকে এরা রীতিমত কর আদায় করত। কিন্তু সেই প্রতাপের অড়ালেও দেখা যায় যে পুরোহিত ও শাসকবৃন্দই প্রকৃতপক্ষে গরীব জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব করছে। সম্রাটরাও বড়লোকদেরই স্বার্থ বাঁচিয়ে চলত। আসিরীয়দের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্বল জাতিরা অনেকবার বিদ্রোহ করেছিল। সেই বিদ্রোহে যত চাষী ও ক্রীতদাস সবাই ছিল একদিকে। সেই সব বিদ্রোহের ফলে ক্রমে ক্রমে আসিরীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

এর পরে কালডিয়া নামে আর একটি আরব জাতি আসিরীয়দের তাড়িয়ে দিয়ে বাবিলনে আধিপত্য করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাট হচ্ছেন

নেবুকাদ্‌নেজার (Nebuchadnezzar)। তাঁর আমলে বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের অনেক উন্নতি হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দে পারস্যের এক যাযাবর মেষপালকের দল এই প্রাচীন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে দখল করে নেয়। প্রায় দুশোবছর পর এই পারস্য সাম্রাজ্য আবার বিশ্ববিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের পদানত হয়। যে উর্ব্বর উপত্যকার লোভে পৃথিবীর চারদিক থেকে লোক এসে মেসোপোটেমিয়াতে জড়ো হয়েছিল, তা এবার হ'ল গ্রীসের অন্যতম প্রদেশ। গ্রীসের পর রোমকরাও এদেশ দখল করেছিল। রোমের পর তুর্কীরাও মেসোপোটেমিয়াকে রেহাই দেয় নাই। সেই থেকে নানা আক্রমণের ধাক্কার ধাক্কায় মেসোপোটেমিয়া হ'য়ে পড়েছে শ্মশান। শুধু এদিক সেদিকে ছড়ানো পূর্ব্বের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই সেখানে নেই এখন।

অতীত যুগ ছেড়ে এক লাফে চলে এসো বর্ত্তমান যুগে। অতীতের গৌরব আর নেই মেসোপোটেমিয়ার। কিন্তু তখনো যেমন উর্ব্বরা উপত্যকার লোভে নানা জাতি এদেশ আক্রমণ করত, এখনো তেমনি শক্তিমান জাতিরা মেসোপোটেমিয়ার মাটীর নীচের তেলের জন্যে দেশ দখলে রাখতে চায়। ১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধ শেষ হ'লে ইংল্যাণ্ড মেসোপোটেমিয়ার অভিভাবক হ'য়ে থাকে। পিছিয়ে পড়া দুর্ব্বল দেশগুলোর উপর এভাবে অভিভাবকত্ব করার মানেই হচ্ছে সে দেশ জয় করা! ইংরাজীতে এভাবে শাসনের নাম 'ম্যাণ্ডেট' (Mandate)। এক পাল গরু কি হরিণের অভিভাবক যদি জোয়ান বাঘকে করা যায়, তাহলে যা হয় কিনা মেসোপোটেমিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডের অভিভাবকত্ব হ'ল তাই।

যাদের উপর অভিভাবকত্ব দেওয়া হ'ল, তারা কিন্তু মোটেই ইংরাজদের অধীনে থাকতে চাইল না। দেশের চারদিকে স্বাধীনতার আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। গায়ের জোরে আর ভবিষ্যতে স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়ে ইংরাজরা সে আন্দোলন দমন করে। ১৯২১ সালে তারা সিরিয়ার রাজা ফৈজলকে মেসোপোটেমিয়ার সিংহাসনে বসায়। কিন্তু দেশের লোক তাকে

চায়নি। তারা বুঝেছিল যে, মেসোপোটেমিয়াকে নামে স্বাধীন বলে ইংরাজরা ফৈজলের মারফৎ দেশ শাসন করবে। দেশপ্রেমিকরা চাইল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

ইংরাজরা তখন জোর করে রাইফেল, বেয়নেট আর এরোপ্লেনে বোমবাজী করে সে আন্দোলন দমন করে। এত করেও তবু ইরাকীদের স্বাধীনতার আন্দোলন দমন করা যায় নি। আন্দোলনের ফলে ইংরাজদের বাধ্য হ'য়ে নানা সুবিধা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখন মিশরের মত ইরাকও নামে মাত্র স্বাধীন। কিন্তু কার্য্যতঃ তারা ইংরাজদের অধীন।

ভ্রাম্যমান মূষা সম্প্রদায়

খ্রীষ্ট-খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে ইউফ্রেটিস নদীর মোহনার কাছে একদল সেমাইট সম্প্রদায়ের পশুপালক বসবাস করত। বাবিলনের ধন-সম্পদের উপর তাদের লোভ হয় ও তারা সদলবলে বাবিলন আক্রমণ করে। কিন্তু বাবিলনীয় সৈন্যদের কাছে পরাজিত হ'য়ে তারা আরও পশ্চিমদিকে চলে যায় অন্য কোনও নতুন দেশে বসবাসের চেষ্টায়।

এই পশুপালকদেরই নামই হ'ল ইহুদী বা হিব্রু। সামান্য আশ্রয়ের আশায় তারা কত যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াল তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে মিশরে এসে তারা বিশ্রাম করবার জায়গা পেল। ক্রমে ক্রমে মিশরের লোকদের সঙ্গে ভাব করে তারা প্রায় পাঁচশো বছর সেখানে শান্তিতে কালাতিপাত করেছিল। এমন সময় সে দেশে হ'ল হিকশাসদের আক্রমণ। ইহুদীদেরও কেমন দুর্বুদ্ধি হ'ল—আশ্রয়দাতা মিশরের লোকদের সঙ্গে তারা করল বিশ্বাসঘাতকতা! আক্রমণকারী হিকশাসদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইহুদীরা আরও কিছুদিন নিরাপদে মিশরে পশুপালন করেছিল। কিন্তু এ আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ, আগেই বলেছি যে মিশরীয়রা অনবরত স্বাধীনতার সংগ্রাম করছিল এবং একদিন সত্যি সত্যি তারা হিকশাসদের তাড়িয়ে স্বাধীন হ'ল। তখন বিশ্বাসঘাতক

ইহুদীদের আর দুরবস্থার সীমা রইল না। মিশরীয়রা তাদের সঙ্গে ক্রীতদাসদের মত ব্যবহার করত আর তাদের দিয়ে রাস্তা বানানো, পিরামিড তৈরী করা প্রভৃতি হাজার রকমের কাজ করিয়ে নিত। সে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির আশাও ছিল কম। মিশরের চতুঃসীমায় থাকত সারাক্ষণ প্রহরী। তাদের চোখে ধূলো দিয়ে পালানো সহজ কথা নয়।

এমনি দুঃখকষ্টের ভিতর বহুদিন কেটে গেল। তারপর ইহুদীদের মধ্যে আবির্ভাব হয় একজন তরুণ নেতার। তাঁর নাম মুষা। অনেক গবেষণার পর তিনি আবিষ্কার করেন যে, পূর্ব্বপুরুষদের মত সহজ জীবন যাপন না করে বিদেশী সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে তারা যখন থেকে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটেছে—তখন থেকেই শুরু হয়েছে তাদের দুর্দ্দিন। তাঁর জাতির সকলকে তিনি এই সমস্ত কথা খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। ক্রমে মুষার একান্ত চেষ্টা হ'ল অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির জন্য। সমস্ত ইহুদী জাতিকে আবার তিনি শান্তির পথে চালাতে চাইলেন। সবাইকে এক করে তিনি পালিয়ে এলেন মিশর থেকে। মিশরের সৈন্যরা তাদের পেছনে পেছনে এসেও ধরতে পারল না। সেই পলায়নপর ইহুদী জাতিকে নিয়ে মুষা সিনাই পর্ব্বতের উপত্যকায় আস্তানা গাড়লেন।

মরুভূমিতে থাকতে গেলে ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্র, বিদ্যুতের ভাবনায় প্রাণ হাতে করে থাকতে হয়। তাই মরুবাসী মাত্রেই এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে ভীষণ ভয় করে। তারা এ সমস্তকে এক একটি দেবতা বলে মনে করত। ঝড় ও বজ্রের দেবতাকে তুষ্ট রাখতে পারলেই তবে তারা শান্তিতে থাকতে পারবে এই ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ঝড় ও বজ্রের দেবতাকে মুষা বললেন 'জিহোবা'—এবং তিনিই ইহুদীদের হলেন একমাত্র প্রভু। জিহোবার দশটি আদেশ অনুসারে তাদের চলতে হ'ত।

শুধু এতেই মুষা শান্ত হলেন না। তিনি ইহুদীদের নিয়ে আবার চলতে থাকেন! মরুভূমির যাত্রার আর শেষ নেই! চলতে চলতে যখন আর কেউ ধৈর্য্য রাখতে পারছে না, এমন সময় তারা এক সুন্দর সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশে উপনীত

হ'ল। এ দেশের নাম প্যালেষ্টাইন। ক্রীট জাতির একটি অংশ নিজেদের আদিম বাসভূমি ক্রীট দ্বীপ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে এখানে বসবাস করত। তাদের নাম ছিল 'ফিলিস্ত্।' তা থেকেই এ দেশেরও নাম হয় ফিলিস্তীন বা প্যালেষ্টাইন। প্যালেষ্টাইনের বাসিন্দাদের সঙ্গে ভীষণ লড়াই করে ইহুদীরা সেই দেশ দখল করে। তারপর সে দেশের সবচেয়ে বড় শহরে তারা এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করে। ঐ সহরের নতুন নাম তারা দেয় 'জেরুজালেম' বা 'শান্তি-নিকেতন'।

মূষা কিন্তু সে সময় ইহুদীদের সঙ্গে ছিলেন না। প্যালেষ্টাইনে আসবার আগেই তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁর শিক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে ইহুদীরাই পৃথিবীতে অন্য সব জাতির আগে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে পেরেছিল।

ইহুদীরা খুব ভাল ব্যবসাদার। প্যালেষ্টাইনে এদের আদিম বাসভূমি হ'লেও এরা সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে এমন দেশ নেই যেখানে ইহুদী নেই। এদের মধ্যে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও দার্শনিক জন্মেছিল। যে দেশেই এরা থাক না কেন—সে দেশেই এরা নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তার করে বসে। ইংল্যাণ্ডে ইহুদী প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনও ইহুদী। দার্শনিক কার্ল মার্ক্সও ঐ ইহুদী বংশে জন্মেছেন।

ইহুদীদের ঐশ্বর্য্য দেখে অনেক জাতিই ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তা ছাড়া খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারকদের হাতে ইহুদীরা ভীষণ উৎপীড়ন ভোগ করেছে আগে। মধ্যযুগের ইওরোপে 'ইহুদী শিকার' ছিল মজার খেলার মত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো না পাওয়ায় মানুষ এত ধর্ম্মান্ধ ছিল যে, ধর্ম্মের নামে কত যে নিরীহ ইহুদীর রক্তপাত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ইহুদী তাড়ানোকে বলা হ'ত ইনকুইজিশন্ (inquisition).

তারপরে ইওরোপের মানুষ ধর্ম্ম নিয়ে বা জাত নিয়ে আর কখনো তেমন খুনোখুনি করে নি। কিন্তু জার্মানীর হিটলার এত সভ্যযুগেও শুরু করেছিলেন ইহুদী বিতাড়ন। ইহুদীদের উপর তিনি যে অত্যাচার করেছিলেন তার কাছে অতীতের ইনকুইজিশনও ম্লান হয়ে যায়। দেশের যেখানে যত ইহুদী ছিল,

তাদের সবাইকে তিনি এক করে গরু ভেড়ার মত খোঁয়াড়ে বন্দী করে রাখেন; তাদের সব সম্পত্তি হয় বাজেয়াপ্ত। সমস্ত ইহুদী পণ্ডিতদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আইনষ্টাইন তাই আমেরিকায় গিয়ে আছেন।

হিটলারের দেখাদেখি অন্য সমস্ত ফ্যাশিস্ট দেশগুলোতেও ইহুদীদের উপর অত্যাচার করা হ'তে থাকে। অনেক ইহুদী তখন প্যালেষ্টাইনে পালিয়ে এসে থাকতে চায়। নতুন ইহুদী বসতি গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে প্যালেষ্টাইনে।

ফিনিসীয় বণিক

ইহুদীদের প্রতিবেশী আর একটি সেমাইট জাতির লোক ভূমধ্যসাগরের কিনারায় বাস করত। তারা হচ্ছে ফিনিসীয়। টায়ার ও সিডন নামে তারা

ফিনিসীয় পালতোলা জাহাজ।
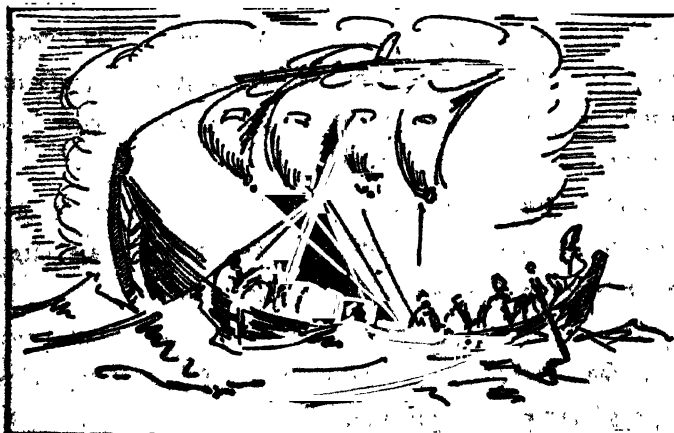
খুব সুরক্ষিত দুটো দুর্গের মত শহর তৈরী করেছিল। দেখতে দেখতে সমস্ত ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য তাদের একচেটিয়া হয়ে যায়। গ্রীস, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি নানা দেশে তাদের বাণিজ্য জাহাজ রীতিমত যাতায়াত করত;

এমন কি ভূমধ্যসাগর পার হ'য়েও কখনো কখনো তারা আরও দূরদেশে যেতে ভয় পেতনা। কোনও জায়গায় গেলেই তারা সেখানে ছোট খাট দুর্গের মত শহর তৈরী করত। বর্ত্তমান যুগের স্পেনের কেডিজ, ফ্রান্সের মার্সেলিজ বন্দর হচ্ছে তাদের তৈরী দুটো শহর।

ফিনিসীয়রা সভ্যতার উঁচু স্তরে এসে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে ব্যবসার প্রচলন ছিল। একজনকে ঠকিয়ে এক জিনিস নিয়ে আর এক জনকে বিক্রী করে তারা বেশ লাভ করত। সততা বা বিবেক বলে কোনও কথাই তারা জানত না। গরীবদের ঠকিয়ে টাকা করতে পারাটাই তাদের ব্যবসা-জীবনে ছিল একমাত্র কাম্য। আচারে ব্যবহারেও তারা এমন অভদ্র ছিল যে, কোনও জাতিই তাদের সঙ্গে মিশতে চাইত না।

তবে তারা যত খারাপই হ'ক না কেন ব্যবসায়ে তাদের সমান কেউ ছিলনা। ব্যবসায়ের কাজ চালাতে হ'লেই কিছু হিসাবপত্র লেখাপড়া জানা চাই। ফিনিসীয়রা সুমেরীয়দের লেখা জানত। কিন্তু সুমেরীয়দের লেখা এত জটিল আর তা শিখতে এত সময় লাগত যে ফিনিসীয়রা বিরক্ত হ'য়ে এক নতুন লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তারা মোটমাট বাইশটি অক্ষর আবিষ্কার করে। ঐ কয়েকটি অক্ষর দিয়েই তাদের লেখাপড়া চলত। তাদের কাছ থেকে গ্রীকরা সেই বাইশটি বর্ণমালা শিখে আর একটু উন্নত করে। রোমকরা আবার কালক্রমে আরও নানা উন্নতির ভেতর দিয়ে সেই বর্ণমালা বর্ত্তমান ইওরোপীয়দের পূর্ব্বপুরুষদের শেখায়।

ঘোড়সোয়ার হিন্দী-ইওরোপীয়

মিশর, বাবিলন, আসিরীয় ও ফিনিসীয় জাতি প্রায় তিন হাজার বছর নিজেদের অস্তিত্ব আর প্রভুত্ব বজায় রেখেছিল। তারপর তাদের নিজেদের মধ্যে দেখা গেল সংকীর্ণতা। শোষণের ফলে প্রত্যেক জাতির ভেতরেই এমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী গড়ে উঠেছিল যে শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহ দমন করতেই

থাকতেন ব্যস্ত। একদিকে অত্যাচার আর একদিকে বিদ্রোহের চেষ্টা, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে অতীতের রাষ্ট্রগুলো সব দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। তখন আর এক নতুন তরুণ জাতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এদের ধ্বংস আরম্ভ হয়। এদের বলা হয় হিন্দী-ইওরোপীয় জাতি।

জাতি বলতে আমরা যেমন একই রক্তের বংশ বুঝি এরা তা নয়। এরা যে ভাষায় কথা বলত তাকে বলা হয় হিন্দী-ইওরোপীয় ভাষা। তা থেকেই যারা ঐ ভাষায় কথা বলে তাদের বলা হয় হিন্দী ইওরোপীয় জাতি। কারণ এরা হিন্দুস্থান (ভারতবর্ষ) থেকে আরম্ভ করে সারা ইওরোপ জয় করেছিল।

সেমাইটদের মত এই হিন্দী-ইওরোপীয়রাও শ্বেতকায়। ইওরোপের হাঙ্গারী, ফিনল্যাণ্ড ও উত্তর স্পেনের বাস্ক প্রদেশ ছাড়া আর সব জায়গাতেই হিন্দী-ইওরোপীয়দের ভাষা থেকেই ভাষা তৈরী হয়েছে। এরা যে প্রথমে কোথায় থাকত তা নিয়ে এখনো মতভেদ আছে। সাধারণতঃ পণ্ডিতরা মনে করেন যে মধ্য এশিয়াই এদের বাসস্থান ছিল। কিন্তু লোক বেড়ে যাওয়ায় সেখানে তাদের স্থানাভাব হয়। তখন তারা যে যেদিকে পারল নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। একদল বহু শতাব্দী ধরে মধ্যএশিয়ায় পারস্যের মালভূমিতে বসবাস করেছিল। তাদের বলা হ'ত 'আইরা'। 'আইরা' শব্দ থেকেই ইরাণ কথাটির উৎপত্তি। ভারতে যারা এল, সংস্কৃতে তাদের নামের উচ্চারণ হ'চ্ছে 'আরিয়া'। তাথেকেই আর্য্যাবর্ত্ত শব্দ এসেছে। আর একদল ছড়িয়ে পড়ল ইওরোপে।

যখন মিশর, মেসোপোটেমিয়ার বিভিন্ন জাতি পিতৃশাসন ও দাসত্বযুগ পার হ'য়ে সামন্ত যুগে পৌঁছেছিল, তখন হিন্দী-ইওরোপীয় জাতিরা কেবলমাত্র জংলী অবস্থা থেকে পৌঁছেছিল 'জনযুগে'। পশুপালন তারা ধীরে ধীরে শিখছিল।

হিন্দী-ইওরোপীয়দের মতই 'আর্য্যজাতি' বলা আমাদের ভুল হয়। সংস্কৃতে আর্য্য বলে কোন্ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৈদিক সমাজে শূদ্র ছাড়া অন্য তিন শ্রেণীর লোককে আর্য্য বলা হ'ত। যারা বেদের সভ্যতায় দীক্ষিত তারাই ছিল আর্য্য। কিন্তু তারা কেউ একই বংশের নয়। নানা জাতির লোক ছিল আর্য্য সভ্যতার অধীনে। আর্য্য জাতি না বলে এবার থেকে বলো

আর্য্য সংস্কৃতির বিশেষ বাহক। শিক্ষা, দীক্ষা সভ্যতাকে বলা হয় সংস্কৃতি। ভাষাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, ইওরোপীয় ও ভারতীয় আর্য্যরা দেবতাদের বলত 'পিতর'। 'পিতর' কথা থেকে মনে করা হয় যে ঐ সব সমাজ ততদিনে পিতৃশাসনের যুগে পৌঁছেছিল। তা না হ'লে পিতার এত প্রাধান্য কেমন করে হয়? গরুকে সংস্কৃতে 'গৌ,' ও নানা দেশে 'কৌ', 'গব,' 'গাব' বলত। শব্দগুলির উচ্চারণ প্রায় একই রকম, তাই না? এথেকে বোঝা যায় যে তারা সকলে 'গরু' শব্দটির সঙ্গে সুপরিচিত ছিল। ভেড়াকে সংস্কৃতে 'অবি', শ্লাভ ভাষায় (রুশিয়ায়) 'ইবিস', কুকুরকে সংস্কৃতে 'শ্বক্' রুশে 'শোবক' বলত। এথেকে জানা যায় যে তারা ততদিনে পশুপালনও শিখেছিল।

পশুর সম্বন্ধে যেমন প্রায় একই রকম ভাষা এ সমস্ত জাতির মধ্যে পাওয়া যায় তেমন কিন্তু চাষবাসের কাজের কোনও এক রকম ভাষা পাওয়া যায় না। শুধু ভারতীয় ও ইরাণী ভাষায় অনেক কিছুর মিল পাওয়া যায়। যেমন ধর, সংস্কৃতে গমকে বলে 'গোধূম'—আর ইরাণীতে 'গন্দুম', যবকে সংস্কৃতে 'যব' আর ইরাণীতে 'যৌ'!

হিন্দী-ইওরোপীয় জাতিরা ঘোড়া পালন করতে শিখেছিল। শুধু ঘোড়ার মাংসই তারা খেত না, ঘোড়াকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়তেও আরম্ভ করেছিল। অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে চেঙ্গিস খাঁ যেমন বারুদের সাহায্যে পৃথিবী জয় করেছিলেন হিন্দী ইওরোপীয়রাও তেমনি ঘোড়ার সাহায্যেই দিগ্বিজয় করতে পেরেছিল, ইরাণী ভাষায় ঘোড়াকে বলে 'অশ্প', আর সংস্কৃতে 'অশ্ব'! একই জিনিসের বা জীবের ইরাণী ও সংস্কৃত ভাষায় প্রায় একই রকম নাম দেখে মনে হয় যে এ দু জাতি, গোড়ায় পশুপালনের ও কৃষির স্তর পর্য্যন্ত একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল।

হিন্দী-ইওরোপীয় জাতি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে নানা জাতিকে পরাজিত করে তাদের মধ্যে দাসত্ব ব্যবস্থা কায়েম করে। কাস্যু নামে সম্ভবতঃ এদেরই একটি শাখা মিডিয়া প্রদেশে পৌঁছে সভ্য মেসোপোটেমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত

হয়। কিন্তু এসব দেশ জয় তত সহজে হয় নি। অনেক দিন যুদ্ধ চলেছিল—অবশেষে ৬০৭ খ্রীঃ পূঃ দু-একত্রে আসিরীয় রাজধানী নিনেভা জয় করে তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। ততদিনে ইরাণী সমাজ দাসত্ব যুগ ছেড়ে সামন্ত যুগে পৌঁছেছিল। ইওরোপে আগে মিশরীয় সভ্যতার এক অংশ ক্রীট সভ্যতা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তরুণ জাতি ঘোড়ার পিঠে চড়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে তাদের অনায়াসে জয় করে নেয়। বিজিতরা তখন পরিণত হয় দাসে।

হিন্দী-ইওরোপীয়দের মধ্যে বিরাট সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। পশ্চিম এশিয়াতে মিডিস ও পারস্যে দুইটি বিরাট সাম্রাজ্য ছিল। সম্রাট সাইরাস-এর রাজত্ব কালে পারস্য সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। তার পূর্ব্ব সীমান্ত ছিল ভারতের মধ্যে, পশ্চিমে মিশর ও সমস্ত পশ্চিম এশিয়া তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর এক বংশধর দারিয়ুস পারস্য সাম্রাজ্য আরও বাড়িয়েছিলেন। তাঁর আমলে মধ্যএশিয়ার অনেকাংশ ও সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। শোনা যায় যে তখন সিন্ধুনদের পার থেকে সোনার গুঁড়ো পারস্যে রপ্তানী করে দেওয়া হ'ত। তখন বোধহয় সিন্ধুনদের পারে খুব সোনার গুঁড়ো পাওয়া যেত। কিন্তু এখন আর সে সব কিছু নেই। চারিদিকে শুধু ধূ ধূ মাঠ!

সম্রাট দারিয়ুস ও জারেক্সেসের রাজত্বকালে ইরাণীরা ঈজিয়ান সাগরের পারে গ্রীস দেশের সঙ্গে বহু দিনব্যাপী যুদ্ধ করেছিল। বহু গ্রীস নগর তারা ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে। কিন্তু তবু এত লোকক্ষয় সত্ত্বেও সমস্ত গ্রীস দেশ তারা পদানত করতে পারেনি। এথেন্স-এর নৌশক্তি চিরকালই অপরাজেয় থেকে যায়। যত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইরাণীরা আক্রমণ শুরু করুক না কেন এথেন্সের নৌবহরের কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার করে ভাল ছেলের মত আবার নিজের দেশে ফিরে আসতে হ'ত।

এইভাবে সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। পরের নানা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও নানা ইতিহাস পাবে তোমরা।

'চাঁদের দেশ' ভারতবর্ষ

বহু বহু যুগ আগে গ্রীসের বা রোমের লোক যখন সভ্যতার মুখও দেখেনি তখন ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুনদের তীরে বাস করত এক
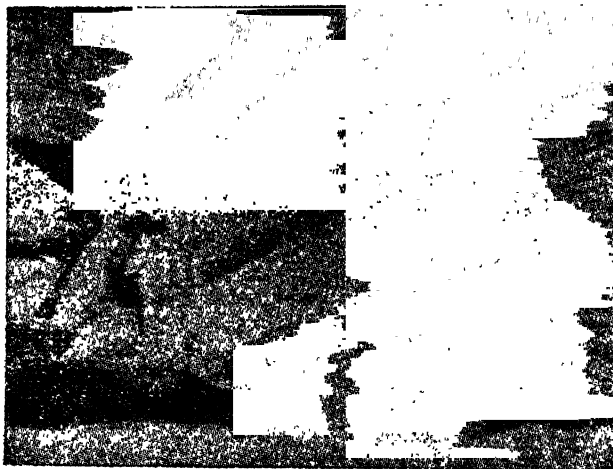
মহেন-জো-দাড়োর প্রাচীর

সুসভ্য জাতি। তারা থাকত ইটের পাকা বাড়ীতে। তাদের শহরে চওড়া বড় বড় রাস্তা ছিল। রাস্তার দুপাশে নোঙরা জল নিষ্কাশনের জন্য ছিল ঢাকা ড্রেন। আধুনিক যে কোন উন্নত শহরের সঙ্গে সে সব শহরের তুলনা চলে। সোণা, তামা, রূপা, এ সবই তারা ব্যবহার করত। আর তারা এমন চমৎকার বাসন বানাতে পারত যে তোমরা বলতেই পারবে না—সেগুলো অতদিন আগের তৈরী। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৩।৪ হাজার বছর আগে ঐ অঞ্চলে সভ্যতার প্রচলন হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা কিন্তু হঠাৎ এটা আবিষ্কার করেছিলেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় সিন্ধুপ্রদেশে মহেন-জো-দাড়ো ও পশ্চিম পাঞ্জাবের

হড়প্পাতে বহু স্তূপ দেখতে পেয়ে প্রথমে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তখন ১৯২২ সাল। ক্রমে ক্রমে মাটী খুঁড়ে নানা জিনিস আবিষ্কার হ'ল। সে

সে যুগের অস্ত্রশস্ত্র
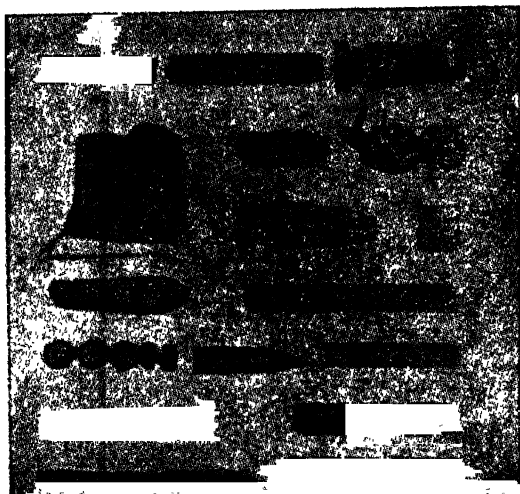
সব জিনিস দেখে অনেক পণ্ডিত নতুন করে ভারতের ইতিহাস লিখতে চাইছেন।

মহেন-জো-দাড়ো আর হড়প্পায় বহু চিত্রিত মাটীর বাসন পাওয়া গেছে। হড়প্পাতে দুটি মানুষেরও মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। সেগুলো যে কোন গ্রীক ভাস্কর্য্যের সঙ্গে তুলনীয়। হাতীর দাঁত আর নানারকম ধাতু দিয়ে সে যুগের লোক গহনা তৈরী করত।

তখনও লোহা আবিষ্কার হয়নি। তামা দিয়েই বেশীর ভাগ কাজ হ'ত। অর্দ্ধচন্দ্রের মত গোল করাতও পাওয়া গেছে। এখানে যে ধরণের করাত পাওয়া গেছে পৃথিবীর অন্য কোন প্রাচীন দেশ মিশর বা মেসোপোটেমিয়াতেও তা দেখা যায় নি। জগতের অন্য কোনও দেশ যখন তাঁতের কাপড়ের নাম

শোনেনি তখনই ভারতে তাঁতের কাপড়ের ব্যবহার ছিল। শুধু পাকা ইটের বাড়ীই যে ছিল তা নয়। ঘর বাড়ীগুলি এত বড় বড় ছিল যে তার কিছুই মিশর বা মেসোপোটেমিয়াতে ছিল না। সে সব দেশে খুব জমকালো রাজবাড়ী, মন্দির, নয়তো পিরামিড তৈরী হ'ত। কিন্তু গরীবদের থাকতে হ'ত সেই দূরের মাটীর কোঠাতেই। সিন্ধু উপত্যকায় কিন্তু হ'ত ঠিক এর উল্টো। এখানে যত কিছু ভাল বন্দোবস্ত তা সব নাগরিকের জন্যেই করা হ'ত। পাতলা মাটীর পাতের উপর পশুর মূর্ত্তি এঁকে শিলমোহর ও করা হ'ত।

হড়প্পাতে মাটীর ভাঁড়ে শিশুদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তাথেকে মনে হয় যে শিশুদের তখন কবর দেওয়া হ'ত। এখনো হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা চলে আসছে।

আবার মাটীর হাঁড়ীতে মরা মানুষের অস্থি ও ভস্ম জমা করা আছে সেখানে। সে দেশের লোক লিঙ্গ পূজা করত। তখনকার যে সমস্ত দেব-দেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে—বৈদিক যুগের সঙ্গে তার বহু মিল আছে। শুধু দেবদেবীই নয়, শবদাহপ্রথা, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এ সমস্তই বৈদিক যুগের সঙ্গে মিলে যায়।

এসব দেখে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে মহেন-জো-দাড়ো আর হড়প্পার সভ্যতা ও বেদে যে সভ্যতার কথা আছে তা একই সময়ের।

অনেক পণ্ডিত কিন্তু একথা মানেন না। তাঁরা বলেন যে মহেন-জো দাড়োতে যারা থাকত সে সব লোকের সঙ্গে বেদের লোকের অনেক পার্থক্য আছে। সে যাই হোক্, আমরা দেশেরই জিনিস বলে মহেন-জো দাড়ো আর বৈদিক যুগ, দুইয়েরই সভ্যতা নিয়ে গর্ব্ব করি। অনেকে বলেন যে বৈদিক আর্য্যরা বিদেশ থেকে এসেছিল। কিন্তু ডাঃ দত্তের মতে তারা বিদেশী নয়। ভারতেরই তারা লোক।

নানা জাতের লোক মিলে তখনকার সমাজ গড়ে উঠেছিল। তখন তো ভারতবর্ষের সমাজ ছিল 'জনযুগে' তাই জাতীয়তার ভাব কারুর মধ্যেই তখনো আসেনি। আর্য্যদের সে জন্যেই জাতি বলা যায় না।

বড় হ'য়ে বেদের মন্ত্র পড়লে বুঝবে যে প্রত্যেক মন্ত্রের ভেতরেই পূর্ব্বপুরুষদের স্তব আছে। পিতা পিতামহ সম্বন্ধে এঁদের স্তবের শেষ নেই। এ থেকে মনে হয় যে বেদের যুগেই ভারত আদিম সাম্যতন্ত্র থেকে পিতৃশাসিত সমাজে পা দিয়েছিল।

কলিকাতার যাদুঘরে মহেন-জো-দাড়োর অনেক জিনিস রক্ষিত হয়েছে। তোমরা গিয়ে একবার দেখো না—সেই কোন অতীতের ভারতের গৌরবের জিনিষগুলো?

আর্য্য ভাষীদের লেখা নানা বেদ থেকেই আমরা প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার ইতিহাসের সন্ধান পাই।

আফগানিস্থানে বসতি করবার সময়ই হয়তো তারা পিতৃশাসনের যুগে পৌছেছিল। একটি কথা তোমরা ভুলো না যে এখন আফগানিস্থান, কি বেলুচিস্থান ভারতের বাইরে হ'লেও আগে ভারতের মধ্যে ছিল। রামায়ণ, মহাভারত সব পৌরাণিক গ্রন্থে গান্ধার প্রদেশের নাম পাবে। এখন যাকে কান্দাহার বলে গান্ধার হচ্ছে সেই দেশ। তারপরে ভারতের আর্য্য-ছাড়া অন্য আদিম বাসিন্দাদের সম্পর্কে এলে এরা যুদ্ধে জিতে বন্দীদের দাস করে রাখতে আরম্ভ করেছিল। দাসদের খাটিয়ে বেশী জিনিষ বানানো যেত।

পরিবারগুলোতে পিতার কর্ত্তৃত্ব ছিল বেশী। সমস্ত পরিবারগুলো মিলে নিজেদের প্রতিনিধি দিয়ে শাসন কাজ চালাত। প্রতেক পরিবারের লোকদের প্রতিনিধি নিয়ে শাসন ব্যবস্থা হ'ত। তাকেই বলা হ'ত 'গণতন্ত্র'! গণতন্ত্রের শাসনে সকলের সমান অধিকার ছিল। কিন্তু দাসদের গণতন্ত্রে যোগ দেবার অধিকার ছিলনা। তাদের বাদ দিয়েই গণতন্ত্রের প্রতিনিধি পাঠানো হত।

পিতৃশাসনের গোড়ার দিকে ভারতে রাজার শাসন তত বেশী দেখা যায় না। গণতন্ত্রই বেশী প্রচলিত হ'লেও রাজতন্ত্রেরও দু-একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঞ্জাব থেকে যতই আর্য্যরা সমভূমিতে নেমে গঙ্গা-উপত্যকা ধরে পূর্ব্বে এগিয়েছিল ততই তাদের মধ্যে রাজতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল।

এগুলো তখনকার দিনে কারুরই চোখে লাগত না। মাতৃশাসন উঠে গেলেও লোক এত তাড়াতাড়ি মাতৃশাসিত সমাজ ব্যবস্থার কথা ভুলতে পারছিল না। তাই পিতৃশাসনের প্রথম যুগে মাতৃশাসনের বিয়ের মত যার যেমন ইচ্ছে বিয়ে করতে পারত। ইচ্ছে হ'লে স্ত্রীর সঙ্গে কেউ থাকতো নয়তো থাকতো না। ভাই বোনের বিয়ের অজস্র উদাহরণ মহাভারতে দেখা যায়। মহারাজা ইক্ষ্বাকু দুই ছেলেকে নির্ব্বাসিত করেছিলেন। তাঁরা তাদেরই বোনকে বিয়ে করেছিলেন। দশরথ 'জাতকে' আছে যে, সীতা রামের স্ত্রী আর বোন, দুই হ'তেন।

বিয়ে না করেও লোক স্বামী-স্ত্রীর মত থাকত অনেক সময়। অর্জ্জুন মণিপুর-রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অমনি প্রায় তিন বছর ছিলেন। গৌতম ঋষি আর জনপদ অপ্সরার অমনি মিলনের ফলে কৃপাচার্য্যের জন্ম। তেমনি ভরদ্বাজ ঋষি ও স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচীর ছেলে হ'লেন দ্রোণাচার্য্য। ব্যাস ও ঘৃতাচীর ছেলে হ'ল শুকমুনি।

মাতৃশাসনের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, যখন বিয়ে ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তখনও মাঝে মাঝে বিয়ে ছাড়াও স্ত্রীপুরুষ মিলতে পারত। যতই দিন যেতে লাগল, পিতৃশাসন ততই সমাজে কায়েম হ'য়ে বসল। তখন এসব প্রথা লোকে বর্জ্জন করে।

এমনি করে ভারতবর্ষ 'সামন্তযুগে' প্রবেশ করে।

সামন্ত যুগ কাকে বলে? পিতৃশাসনের কালে ভারতের সমাজে সাম্যভাব ছিল না। গরীব আর বড়লোকের ভিতর সমাজ ভাগ হ'য়ে গিয়েছিল। আবার ভিন্ন ভিন্ন 'জনে'র বড়লোকরা চাচ্ছিল অন্য 'জনে'র সবাইকে দমন করে ক্ষমতা বাড়াতে। 'জনযুগে' এক 'জন' অন্য 'জনে'র সঙ্গে যুদ্ধ করত। তাতে জিতলে লাভ হ'ত 'জনে'র সমস্ত লোকেরই—কারুর একার নয়। প্রথম দিকে জনের সকলে মিলে শাসন কাজ চালাত কিন্তু পরে রাজা নিজেই সমস্ত ক্ষমতা দখল ক'রে নিয়েছিলেন। দুব্যবস্থাতেই ধনিক ও অভিজাতশ্রেণী নিজেদের সুবিধার জন্য দেশের গরীবদের ও সৈন্যদের যেভাবে শোষণ করত—তাকেই

বলে 'সামন্তবাদ'। যতদিন সামন্তবাদ প্রচলিত ছিল, তাকে বলে "সামন্ত যুগ"। সামন্ত যুগ চলেছিল ধনিক সভ্যতার আগে পর্য্যন্ত।

সামন্ত যুগে ভারতবর্ষে সমাজের মধ্যে একশ্রেণীর সঙ্গে অন্যশ্রেণীর সংঘর্ষ লেগেই ছিল!

মধ্যে মধ্যে এসব সংঘর্ষ খুব ভীষণ হয়ে দাঁড়াত। রামায়ণ যারা পড়েছ, তারা নিশ্চয়ই জানো যে মহাব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের দেখতেই পারতেন না। ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ছিল তাঁর আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ। ক্ষত্রিয়দের নেতা ছিলেন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ক্ষত্রিয়দের অত্যাচারে তখন ব্রাহ্মণরা খুব কষ্ট পেত। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ চলেছিল প্রায় একশো বছর ধরে। এ যুদ্ধে হেরে গিয়ে ব্রাহ্মণদের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। ক্ষত্রিয়রাই সমাজের শাসক হ'ল। ব্রাহ্মণদের হাত থেকে শাসনভার গিয়ে পড়ল ক্ষত্রিয়দের হাতে। কিন্তু এতদিনের সংঘর্ষের ফলে ব্রাহ্মণরাও তাদের কাছ থেকে কতগুলো সুবিধা আদায় করে নেয়। ব্রাহ্মণরা হ'ল পুরোহিত—যজমানদের কাছ থেকে দক্ষিণা পাবার অধিকার রইল তাদের। আর কোন রাজা বা অন্য কেউ ব্রাহ্মণকে ফাঁসী দিতে পারবে না। ব্রহ্মহত্যা পাপ বলে প্রচারিত হল।

এর পর এল **বৌদ্ধযুগ**।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৫৬৩ বছর আগে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। ক্ষত্রিয় রাজবংশে তাঁর জন্ম এবং ছোটবেলায় তাঁকে সিদ্ধার্থ বলে ডাকা হ'ত।

রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিতপালিত হ'লেও তখনকার সামন্তবাদী ভারতে গরীবদের উপর অত্যাচার তাঁকে বিচলিত করে তোলে। তিনি রাজ্য ত্যাগ করে সাধনা করতে লাগেন কিভাবে মানুষের দুঃখ দূর করা যায়। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার তখন ক্রমশঃই বাড়ছিল। বুদ্ধদেব ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে দেশের গরীব বড়লোকের ভেদাভেদ তুলে দিতে চাইলেন।

বুদ্ধদেবই ভারতে প্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুলে দেবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরই শিক্ষায় নিজেকে ভুলে লোক আর পাঁচজনেরও

কথা ভাবত। বুদ্ধের শরণ নেওয়া মানে ছিল তাঁর আশ্রমের শরণ নেওয়া। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

বুদ্ধদেব কি বলেছিলেন জানো? তাঁর কাহিনী সব লেখা আছে নানা 'জাতকে'। একটি 'জাতকে' তিনি পৃথিবীতে গরীব বড়লোকদের হিংসার উৎপত্তির বর্ণনা করেছেন। তাতে বলেছেন যে প্রথমে হয়তো একজন কেউ খাবার-দাবার জমা করেছিল। তার দেখাদেখি অন্য পাঁচজনেও জমা করতে শেখে। এমনি করে বড়লোকরা সকলে খাবার জমা করার ফলে গরীবদের ভাগে খাবার কম পড়ল। তারা এক হ'য়ে আওয়াজ তুলল যে দেশে পাপের বন্যা এসেছে—তাদের খাবার নেই কিছু! বড়লোকদের ধরে ধরে তারা, একবার, দু'বার, তিনবার বলল: "আপনারা আমাদের খাবার লুকিয়ে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন, আর কখনো এমন করবেন না।" অনেকে রাগে দুঃখে তাদের ধরে মারতে শুরু করে। এমনি করেই প্রথমে পৃথিবীতে হ'ল চুরি, ডাকাতি, মারামারি আর কাটাকাটির আরম্ভ।

এথেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছ যে বুদ্ধদেবের মতে কুলের সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার খুব অন্যায়। তিনি ব্যক্তির চেয়ে কুলের সকলের স্বার্থ বড় বলে মানতেন। বৌদ্ধদের আশ্রমকে বলত সঙ্ঘ'।

বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন সমাজের সকলের সাম্যবাদ, কিন্তু কাজে তিনি মাত্র তাঁর শিষ্য, শিষ্যাদেরই মধ্যে সেগুলো বাধ্যতামূলক করে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর শিষ্য শিষ্যাদের বলা হয় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী।

ভিক্ষুদের নিজের বলতে মাত্র আটটি জিনিষ থাকত। কেউ মরে গেলে তার সে সব সম্পত্তি চলে যেত 'সঙ্ঘের' হাতে।

কিন্তু বুদ্ধদেবের যত ইচ্ছেই থাকুক না কেন, এক শতাব্দী যেতে না যেতেই ভিক্ষুদের জিনিষপত্র বাড়তে লাগল। সেগুলো নামে মাত্র রইল সঙ্ঘের হাতে।

বলত, বুদ্ধের এত ভাল নিয়ম কেন টিকল না? ভারতে তখন চলেছে সামন্তবাদ। গরীবদের দিয়ে খাটিয়ে যেসব জিনিসপত্তর বানানো হচ্ছিল, তা ভোগ করছিল সমাজের কয়েকজন বড়লোক। গরীবদের হাতে তো কোন

ক্ষমতা ছিল না। বড়লোকরা যা করত তাই তাদের বাধ্য হ'য়ে মানতে হ'ত। বড়লোকরা বুদ্ধের নীতি মানবে কেন? গরীবদের হাতে ক্ষমতা না থাকলে আগের সাম্যবাদের নীতি চলা অসম্ভব।

বৌদ্ধ রাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয়বংশের। তাই ক্ষত্রিয়রা খুব জোর করে নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিল। বৌদ্ধ রাজা অরিন্দম পুরোহিতদের ছেলেদের বলতেন 'হীনজাত'। কোশলের রাজা ব্রাহ্মণদের মুখদর্শন করতেন না। ব্রাহ্মণ রাজকর্ম্মচারীরা কথা বলতে এলে তিনি পর্দ্দার পিছন থেকে কথা বলতেন। ব্রাহ্মণরাও বৌদ্ধদের বলতে আরম্ভ করে ম্লেচ্ছ, অনার্য্য!

ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণদের সংঘর্ষের উদাহরণ দেখে শূদ্ররাও বিদ্রোহ করেছিল। শেষ ক্ষত্রিয় রাজা শিশুপালকে ধ্বংস করে মহাপদ্মনন্দ শূদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন। মহাপদ্মনন্দের মা ছিলেন শূদ্রাণী। এতদিনের নিষ্পেষিত শূদ্রশ্রেণী রাজ্য দখল করেই সমাজে নিজেদের স্থান উঁচু করে নিতে চাইল। আগে ক্ষত্রিয়রা ছিল সব চাইতে শক্তিমান শ্রেণী। তাই শূদ্ররা শাসনকর্ত্তা হয়েই নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে চালিয়ে দিল। এর কিছুকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নতুন করে শূদ্র-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কৌটিল্য নামে এক মহাপ্রতিভাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁর উপদেষ্টা।

তাঁর আমলে মগধের কাছে সারা ভারত বশ্যতা স্বীকার করেছিল। তখনই প্রথম ভারত থেকে বিদেশে দূত পাঠানো হ'ত। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে দাস-প্রথা তুলে দেওয়া হয়। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোক দেশের সকল শ্রেণীকে সমান বলে ঘোষণা করেন। তাঁরই রাজত্বে প্রথম বিচারালয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ভেদাভেদ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া আগের যুগ থেকে ব্রাহ্মণরা যেসব সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছিল, সম্রাট অশোক নানা আইন করে তা বন্ধ করে দেন। ভাল করে দেশশাসন ও প্রজাপালনের জন্য তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে উপযুক্ত লোক বেছে সরকারে চাকুরী দিতেন। সে জন্যেই অশোককে বলা হয় 'মহামতি'। সকলের প্রিয় বলে তাঁকে 'প্রিয়দর্শীও' বলে।

ব্রাহ্মণরা এ অপমান ভুলতে পারে নি। মৌর্য্যবংশের পতন হ'লে পরেই পুষ্যমিত্র সুঙ্গের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণরা শূদ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সে বিদ্রোহে
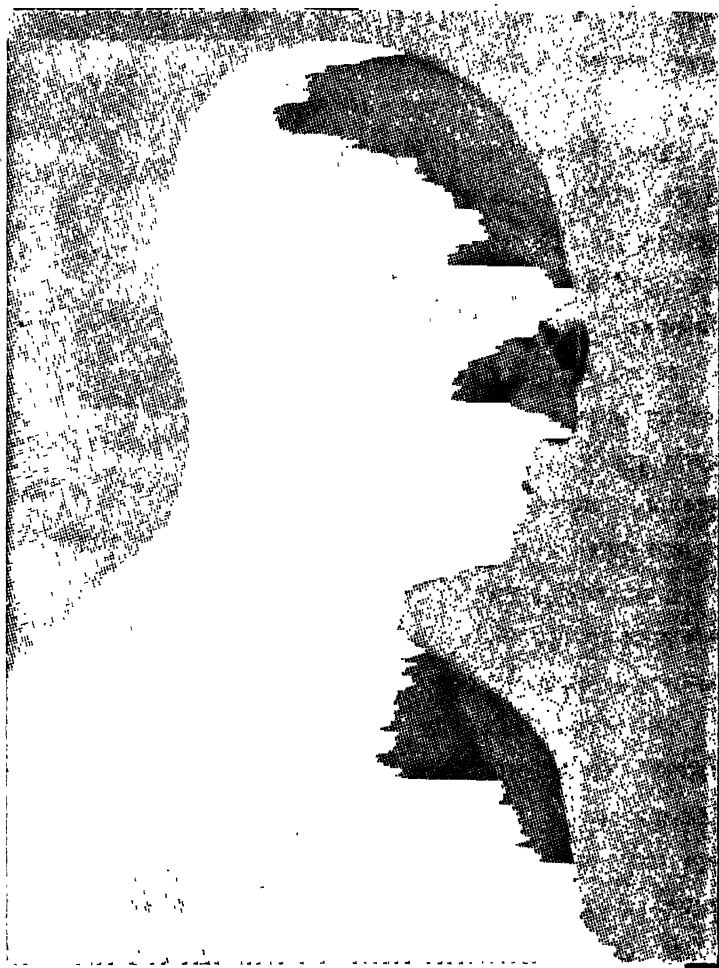
সফল হ'য়ে ব্রাহ্মণরা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে দেশশাসন আরম্ভ করে। দেশের বেশীর ভাগ লোক শূদ্র রাজত্বে যে সব সুবিধা পেত ব্রাহ্মণ-রাজত্বে তা লোপ পায়। ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজে ভেদ বজায় রেখে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। তাই মানুষে মানুষে এল অসাম্য।

তোমরা নিশ্চয়ই 'মনু-সংহিতা'র নাম শুনেছো। এটিই হ'ল ব্রাহ্মণদের প্রামাণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র। এতে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে ব্রাহ্মণরা রাজা কিংবা পুরোহিত দুইই হ'তে পারবে। শূদ্রদের জব্দ করার জন্যে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কথা আছে এতে। শূদ্রকে কোনও সরকারী চাকুরী দেওয়াও নিষিদ্ধ হয়।

এর পর থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত ভারতে একটানা ব্রাহ্মণ রাজত্ব চলেছিল। তাতেই ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব সমাজের অস্থি-মজ্জায় ঢুকে যায়। দাক্ষিণাত্যে তো সেদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-রাজত্ব দেখা যায়। মুসলমান আক্রমণেরও বহুপরে বিজয়নগর রাজ্য ছিল ব্রাহ্মণদের! সেজন্যে সে দিকে শূদ্রদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার হয়েছিল আরও বেশী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্রদের মত বৈশ্যরাও ভারতে রাজত্ব করেছিল। বৈশ্যদের রাজবংশের নাম ছিল 'বর্দ্ধন'। এ বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা ছিলেন 'হর্ষবর্দ্ধন'। রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পেয়ে বৈশ্যরা সমাজে নিজেদের প্রভাব বাড়িয়েছিল।

সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে চীন পরিব্রাজক হিউএন সাং ভারতে এসে-ছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায় যে তখন ভারতকে অনেকে 'ইন্দু-স্থান' বলত! 'ইন্দু-স্থান' মানে হচ্ছে 'চাঁদের দেশ'। সংস্কৃতে চাঁদকে বলে 'ইন্দু', আবার চীনেও চাঁদের নাম হচ্ছে 'ইন্-তু'। দুটোই শুনতে অনেকটা একরকম।

যে শ্রেণী যখন ভারতে রাজত্ব করেছিল, তারাই সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। রাজার বংশ বলে কেউ তখন তাদের নীচু ভাবত না। তাই উত্তর ভারতে এখনো বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়দের স্থান সমাজে অনেক উঁচুতে।

শূদ্রদের হাতে রাজত্ব থাকলেও রাজ্যচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রদের প্রতিপত্তি নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। মনু থেকে আরম্ভ করে মুসলমান যুগের শেষের দিকে বাংলার ব্রাহ্মণ রঘুনন্দন পর্য্যন্ত সবাই শূদ্রদের হীন ও অস্পৃশ্য বলে প্রচার করেছেন। তার কারণ কি?

সামন্ত যুগের শেষের দিকে পৃথিবীর সব জায়গাতেই শারীরিক পরিশ্রম করাটাকে সমাজে খুব হেয় জ্ঞান করা হ'ত। পূজা অর্চ্চনা, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কাজ ছাড়া কেউ চাষবাস, কারিকরী কি এই ধরণের কোন কাজ করলে লোকে তাদের ঘৃণা করত। শূদ্ররাই চাষবাস ইত্যাদি সবরকম কঠিন কাজ করত বলে সামন্তযুগে তাদের করা হয় অস্পৃশ্য!

শূদ্ররাই ছিল প্রথম কারিকর। এসব কারিকররা তখন অন্যের হাত থেকে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য নিজেদের মধ্যে 'সঙ্ঘ' গড়ে তুলত। কারিকর ছাড়াও চাষী, মহাজন, ব্যবসায়ী, খেলোয়াড় এমন কি পুরোহিতদেরও 'সঙ্ঘ' হ'য়ে ছিল তখনকার ভারতবর্ষে। এসব সঙ্ঘের প্রভাব প্রতিপত্তি এত ছিল যে রাজাকেও তাদের মতামত নিয়ে কাজ করতে হ'ত। বৈদিক যুগের একটি ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'ব্রাহ্মণ'। তা থেকে জানা যায় যে এসব সঙ্ঘ পরিচালনা করবার জন্যে সঙ্ঘের ভিতর থেকে একজনকে কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করা হ'ত। তাকে 'মহামাত্য' বলা হয়। তিনি অন্য জন-তিনেকের সাহায্যে 'সঙ্ঘ' পরিচালনা করতেন।

বৌদ্ধযুগের প্রথমে কারিকরদের সঙ্ঘই ছিল বেশী। মৌর্য্যযুগে সঙ্ঘগুলি আরও নানা শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'অন্ধ্র কুশান' যুগে দাক্ষিণাত্যে তেলী, তাঁতী, কবিরাজ—সকলেরই সঙ্ঘ দেখতে পাওয়া যায়। 'গুপ্তযুগে' সঙ্ঘের সাহায্যেই রাজা বিচার করতেন। স্থপতি সংঘের প্রথম উল্লেখ হয় সে সময়। আগের যুগে শূদ্র আর বৈশ্যরা অনেকটা মিলেমিশে চাষবাস করত। কিন্তু সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের আমলে বৈশ্যরা রাজত্ব পেয়ে শূদ্রদের থেকে আলাদা সঙ্ঘ গড়ে তোলে।

এমনিভাবে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে সঙ্ঘ ব্যবস্থা চলে আসছিল। তখন হ'ল মুসলমান আক্রমণ। গোড়া থেকেই মুসলমানদের লক্ষ্য হ'ল সঙ্ঘ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা—কারণ, তা না হলে সঙ্ঘের প্রতিপত্তি এত ছিল যে তাদের রাজ্যশাসন করা হ'ত অসম্ভব। মুসলমান আক্রমণের পর থেকে আমরা ভারতে 'সঙ্ঘের' সন্ধান পাইনি।

সঙ্ঘের উল্লেখ না পাওয়া গেলেও তখন ভারতে 'সঙ্ঘের'ই মত অন্য একটি সমিতির অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। তাকে 'পঞ্চায়েত' বলা হ'ত। এক এক গ্রাম জুড়ে এক এক পঞ্চায়েত ছিল। গ্রাম খুব বড় হ'লে কয়েকটি ছোট ছোট সমিতি সেই গ্রাম শাসন করত। একটি খুব বড় গ্রামের কথা নাও। দাক্ষিণাত্যের চোল-সম্রাট প্রথম পরন্তক এমনি একটি গ্রামের সমিতির বর্ণনা দিয়েছেন। সে গ্রামে উদ্যান, প্রান্তর, পুষ্করিণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমিতি ছিল। গ্রাম্য সমিতি থেকে কোন কাজ করা হ'লে তার ভালমন্দের জন্য সমিতির সভ্যরা সবাই মিলে দায়ী হ'তেন। দেব-উপাসনার কাজ চালাবার জন্যে মন্দির সমিতিও থাকত।

বাংলাদেশে পাল-রাজাদের সময়েও এমনি নানা সমিতির কথা শোনা যায়। বিদেশীরা বাংলা আক্রমণ করে দেশের শাসনক্ষমতা নিজেরা দখল করে। তারা আমাদের একতাকে ভয় করত। তাদের লক্ষ্য ছিল আমাদের পাঁচজন মিলেমিশে যে কাজ করা হ'ত তাই নষ্ট করে ফেলা। তাদের অত্যাচারে এ সমস্ত সমিতির ক্ষমতা কমে আসে। কিন্তু যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাই বাঁচাবার আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যেক সমিতি তার সভ্যদের জন্য কঠিন নিয়মকানুন বেঁধে দেয়। সমিতি ও সঙ্ঘগুলির ভিতরের এত সব কঠিন বাধা-নিষেধ থেকেই আজকের ভারতের অস্পৃশ্যতা এসেছে। পণ্ডিতরা বলেন যে শ্রমবিভাগ হবার ফলে যত ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজের সঙ্ঘ বেশী হয়েছে—ততই পরের যুগে পরাধীন হয়ে সঙ্ঘগুলো এক একটি জাতে পরিণত হয়েছে। যে সঙ্ঘের যেমন সহায়-সম্পদ বা টাকার জোর ছিল—তারাই সমাজে তত উন্নত স্থান পেয়েছে।

বৃটিশ আমল পর্য্যন্ত একটানা সামন্তযুগ চলে এসেছে ভারতে। অন্য সব আক্রমণকারীদের চেয়ে ইংরাজ আক্রমণ ছিল নতুন ধরণের। ইংরাজরা এদেশে কোন নতুন রাজবংশ বসাতে চায়নি। তারা চেয়েছিল ব্যবসা করতে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন—

"বণিকের মানদণ্ড

দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"॥

ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপে সামন্তযুগ ফুরিয়ে গিয়ে কলকারখানা নিয়ে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠে। তারই ঢেউএ ভেসে এসে ইংরাজরা ভারতেও ধনতন্ত্রের ভিত্তি গড়তে থাকে।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

ইংরাজরা যখন প্রথম এদেশে আসে তখন ভারতে কুটির-শিল্প খুব প্রচলিত ছিল। যন্ত্রের বানানো জিনিসপত্তর বিক্রীর জন্যে ইংরাজরা জোর করে সে সব কুটির-শিল্প ধ্বংস করে দেয়। বড় বড় রেল লাইন পেতে দেশ বিদেশের জিনিস এনে তারা ভারতে বিক্রী করে ফলাও ব্যবসা করত। দেশ শাসনের সুবিধা হবে বলে তারা ভাল রাস্তাঘাট বানাল, টেলিগ্রাফ পোষ্টাফিস খুলল। শান্তি স্থাপনের জন্য থানা পুলিশ আরও কত কি করল।

ধীরে ধীরে দেশ থেকে চুরি ডাকাতি অনেক কমে গেল। কিন্তু গরীবদের আর তাতে কি সুবিধে বল? তাদের আছে কি যে চুরি হবে?

ভারতের পরাধীনতায় প্রত্যেকেই দুঃখ পাবে। লোকে বলবে ইংরাজরা কি অত্যাচারী। একটু ভেবে বলতো সত্যি অত্যাচার কারা করে? সমস্ত

ইংরাজই কি অত্যাচারী? তা হ'তে পারে না, কারণ ইংল্যাণ্ডেও তো আমাদের দেশের মত লক্ষ লক্ষ গরীব আছে। তারা তো কেউ শোষণ করে না। আবার আমাদের দেশেও এমন অনেকে আছে যারা ইংরাজ সরকারের তাঁবেদারী করে গরীবদের শোষণ করে। আমরা এখন সাম্রাজ্য-বাদের জাঁতিকলে পড়েছি কি না তাই শোষিত হচ্ছি। গায়ের জোরে কোন দেশ দখল করে, তাকে শোষণ করার নামই হ'ল সাম্রাজ্যবাদ। যতদিন পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততদিন গরীব আর দুর্ব্বল দেশের লোককে অন্য শক্তিমান রাজ্য শোষণ করবে। সেজন্যে ইংরাজদের সবাইকে যেন ঘৃণা না করি।

ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্র ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। প্রথম বৎসর তার আয় ছিল ৮,১৮,০০০ পাউণ্ড (বা ১০৬৩৪০০০৲)। পরের বছরেই আয় হয় ১৪,৭০,০০০ পাউণ্ড। এমনি করে কোম্পানীর রোজগার একশো বছরের মধ্যে প্রায় ৩৫ গুণ বেড়ে যায়।

প্রথমে ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য ছিল ভারতে কোনও কল-কারখানা না খুলে ভারত থেকে কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের কারখানা চালানো। কল-কারখানা চালাতে যে সব জিনিস লাগে তাকেই বলে কাঁচামাল—যেমন, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি। ভারত ও অন্য নানাদেশ শোষণ করে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে টাকা পয়সা হ'ল অনেক। তাদের দেশ তখন কলকারখানায় ভরে গেছে।

ইংল্যাণ্ডের গরীবদের শোষণ করেই তবে ধনিকদের টাকা হ'ত। গরীবরা একজোট হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন্ করে নিজেদের দাবী আদায় করে নিয়েছিল। তাতে কলকারখানা থেকে লাভ অনেক কমে যায়।

সাম্রাজ্যবাদীরা দেখলো যে ভারতবর্ষে গিয়ে কলকারখানা খুললে সেখান-কার অশিক্ষিত গরীব মজুরদের সস্তায় খাটিয়ে অনেক বেশী লাভ করা যেতে পারে। সেজন্যে ধনীরা ভারতে কলকারখানা খুলতে শুরু করল।

যতই দিন যাচ্ছে ততই ভারতের মধ্যেও একদল ধনীরা ইংরাজদের মত কলকারখানা খুলছে। এখন তো প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছো দেশে কত কল-

কারখানা হয়েছে। কলকাতায় আছে পাটের কল, ঝরিয়ায় কয়লার খনি; বোম্বেতে কাপড়ের কল, বার্ণপুর, জামসেদপুরে লোহার কারখানা—আরও কত কি!

কল কারখানা চালাতে হ'লে চাই মজুর। মজুররা বেশীর ভাগই আসে গ্রাম থেকে। গাঁয়ে যাদের জমিজমা নিলাম হয়ে গেছে, কোনও রকমে খাবার সংস্থানের উপায় যাদের থাকত না সেখানে, তারাই চলে আসত শহরে কলে কারখানায় কাজ করতে।

কারখানায় কাজের শেষে তারা নগদ মাইনে পেত। কিন্তু তেমনি শহরের খরচও কত বেশী। যে সামান্য পয়সা তারা পেত তা' দিয়ে কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদনই হ'ত না। গ্রামে তবু আলো বাতাসের মুখ তারা দেখতে পেত। শহরের মত এত স্বাস্থ্য খারাপ হ'ত না। আর কল কারখানায় কাজ করতে এসে তাদের থাকতে হ'ত জঘন্য বস্তিতে, পেটভরে তারা খেতে পেত না।

মাঝে মাঝে মালিকের অত্যাচারে তিক্ত বিরক্ত হ'য়ে তারা কাজকর্ম্ম ছেড়ে চুপ করে বসে থাকত। তাকে বলে ধর্ম্মঘট করা। ক্রমে তারা বুঝতে শিখলো যে নিজেরা এক হ'য়ে না থাকতে পারলে মালিকদের অত্যাচার কিছুতেই কমবে না। তখন তারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য গড়ল 'ট্রেড ইউনিয়ন' (Trade Union)।

মজুররাই সব দেশে বেশী শোষিত হয়। আবার একই সঙ্গে কল কারখানায় হাজার হাজার মজুর কাজ করায় তাদের শৃঙ্খলাজ্ঞান হয় বেশী। একতাও তাদের বেশী থাকে। তা ছাড়া তাদের নিজের বলতে কোনো সম্পত্তি না থাকায় তারাই সকলের আগে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

তাদের সাথী হয় গ্রামের গরীব চাষীরা। ভারতেও মজুর সংগঠন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চাষীদেরও ভিতর জাগরণ এল। তারা গ্রামে গ্রামে কৃষক সভা প্রতিষ্ঠা করল।

ইংরাজ শাসন ভারতের যত ক্ষতিই করুক না কেন, এক হিসেবে কিন্তু এটা ভারতের পক্ষে হয়েছে আশীর্ব্বাদের মত। ভারত যুগযুগান্ত ধরে যে

টিয়ে তালে দিন কাটাচ্ছিল, তাতে আধুনিক জগতে তার কোনই স্থান হ'ত না।

ভারতবর্ষ ছিল সামন্তযুগে। অথচ পৃথিবীর সমাজ এগিয়ে এসে যন্ত্রযুগে পা দিয়েছে। অনেককেই বলতে শুনবে যে যন্ত্রপাতি না থাকাই ভাল। কিন্তু মোটেই তা নয়। মানুষ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে কেন? তা দিয়ে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করা সহজ বলে। যন্ত্র দিয়ে অল্প পরিশ্রমে বেশী কাজ হয়। তাতে সমাজের কত উন্নতি করা যায় বলত।

তবে এটা ঠিক যে বেশীর ভাগ দেশে যন্ত্রপাতি থাকে শুধু বড়লোকদের হাতে। কাজেই তারা গরীবদের কিসে ভাল হয় তা না দেখে শুধু নিজেদের লাভ বাড়াবার চেষ্টা করে। তাই জন্যে গরীব মজুরদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়। এমন কি সময়ে সময়ে দেশের আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ হয়। যখনই লাভ কম হয় তখনই বড়লোকরা লক্ষ লক্ষ মজুরদের বরখাস্ত করে দেয়। বেকার মজুররা তখন কি করবে?

তাদের দুরবস্থা দেখে তখন অনেকে মনে করেন যে এর চেয়ে যন্ত্রপাতি না হ'লেই ভাল ছিল।

যন্ত্র না হ'লে আমাদের চলে না। যত যন্ত্র আবিষ্কার হবে ততই আমাদের সুবিধা। আমরা শুধু চাইবো যেন এতে গরীবদের অসুবিধা না হয়। যন্ত্র দিয়ে যেন সমস্ত সমাজেরই উপকার করা যায়।

ইংরাজ শাসনের যুগে ভারতের সামন্ত ধরণের সমাজ-ব্যবস্থা আর টিকতে পারে নি। সামন্ত-যুগের এক বিশেষত্ব ছিল জমিদারী আর বেগার খাটানো। এখন কি দেখছে? সব জমিদারই বলছে যে জমিদারীতে আর লাভ নেই! চাষী মজুরদের কেউ বেগার খাটাতে পারে না। যন্ত্রপাতি আর কলকারখানা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সামন্ত যুগ ফুরিয়ে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রথমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকরা ইংরাজ-সভ্যতার গুণগানে পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠে। ইংরাজদের সবকিছুই তাদের কাছে ভাল লাগত বলে তারা করত অন্ধ অনুকরণ।

দেশের মধ্যে আবার আর একদল ছিলেন যাঁরা ভারতের জাতীয়তার শিক্ষা পান পাশ্চাত্যের কাছ থেকে।

ক্রমেই আমাদের দেশের লোক ইংরাজদের অধীনতার হাত থেকে বাঁচতে চাইল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে মুসলমানরা তাদের কোনও রকমে সাহায্য করতে চায় নি। মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষাকে ঘৃণা করে এসেছিল। ইংরাজরাও মুসলমানদের তখন বিশ্বাস করত না। সেই সুযোগে হিন্দুরা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে। তারাই প্রথমে ইংরাজী শাসনের মর্ম্ম বুঝতে পেরে নিজেরা এক হ'তে চেষ্টা করে। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে হিন্দুরা এগিয়ে যায়। হিন্দুধর্ম্মই ছিল তাদের আদর্শ। তাদের আন্দোলনের ভিতর হিন্দু ধর্ম্মের গন্ধ থাকে স্পষ্ট।

মুসলমানরা সেইজন্যে মন খুলে সে আন্দোলনে যোগ দিতে পারত না। তারা ইংরাজী শেখেনি বলে হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যেও জাতীয় চেতনা আসে। তারাও তখন হিন্দুদের মত অতীতের ইস্‌লাম ধর্ম্মের আদর্শে নিজেদের আন্দোলন চালাতে থাকে। হিন্দুরা জাতীয় আন্দোলনে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল, আর তারা সংখ্যায় কত বেশী— তাই বলে মুসলমানরা হিন্দুদের মনে মনে ভয় করত। সুতরাং তারা আরও বেশী গোঁড়ার মত মুসলমানদের নিয়ে আন্দোলন চালায়। এখন মুস্লিম লীগ হ'ল এদের প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

অনেকে মুসলমানদের ধর্ম্মের মতি গতি পছন্দ করেন না। তাঁরা বলেন যে স্বাধীনতার আন্দোলনে আবার হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ কেন? আমরা সবাই তো স্বাধীন হ'তে চাই। এ বিষয়ে তাদের ভুল হয়। তোমাদের কিন্তু বুঝতে হবে যে আমাদের দেশ এখনো অন্য সব দেশের মত উন্নত হয় নি। যতদিন দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান, যন্ত্রপাতির প্রচলন বেশী না হবে ততদিন মানুষের উপর ধর্ম্মের প্রভাব বেশী থাকবেই। হিন্দুরা এগিয়ে গেছে বলে তাদের উপর একটু কম প্রভাব হবে, আর মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছে বলে তাদের উপর হবে বেশী। তাবলে কখনো ভেবোনা যে মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতা চায় না।

মুস্লিম লীগের নেতা জিন্না সাহেব।

যারা এগিয়ে যায় তাদের উচিত পিছিয়ে পড়া ভাইকে সাহায্য করা। আমাদেরও মুসলমানদের হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে।

হিন্দুদের ভিতরে উচ্চ শিক্ষিতরা হিন্দু আদর্শে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলল সে কথা আগেই বলেছি। সে আন্দোলনে এগিয়ে আসে আমাদের বাংলা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানের কথা জানো তো? 'বন্দেমাতরম' ছিল জাতীয় আন্দোলনের মূলমন্ত্র। এর মানে হচ্ছে—'মাকে বন্দনা করি'।

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলন দেখতে দেখতে ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একদল তরুণ বিপ্লবী হিংসার পথে ভারত স্বাধীন করার প্রচেষ্টা করেছিল। সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। কত তরুণকে যে ফাঁসী কাঠে প্রাণ হারাতে হয়েছিল তার ইতিহাস পড়ো বড় হ'য়ে।

১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লবী আন্দোলন খুব জোরালো হ'য়ে উঠেছিল। ইংরাজরা বেয়নেটের জোরে সে আন্দোলন দমন করে।

যুদ্ধের পর ভারতবাসীদের সন্তুষ্ট করার জন্য স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রচলন হয়। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস তাতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কয়েকবার অসহযোগ আন্দোলন করে। কংগ্রেস চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯৩০ সালে জওহরলালের নেতৃত্বে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় এ সংকল্প নেওয়া হয়েছিল বলে এখনো প্রত্যেক বছর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তারিখে 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করে সকলে।

রাজনীতির দিকে যেমন ভারত এগিয়ে গিয়েছে, তেমনি শিল্প, সংস্কৃতি বিজ্ঞানেও ভারত আর পিছিয়ে নেই। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে অনেক আগেই ভারতের সামাজিক সংস্কার আরম্ভ হয়েছিল। মহাত্মা রামমোহন রায় ছিলেন সে আন্দোলনের নেতা! তাঁকেই স্বচ্ছন্দে আধুনিক ভারতের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য। তাঁর লেখা জগতের সব দেশের লোক আদর করে পড়ে। তেমনি স্যার মহম্মদ ইকবাল ছিলেন বিখ্যাত উর্দু কবি। স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়ে

বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। মেঘনাদ সাহার নামও তোমরা অনেকে শুনে থাকবে। আচার্য্য জগদীশ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র—এঁরা ছিলেন ভারতের গৌরব।

তোমরা বড় হ'লে এক বিরাট ইতিহাসের উত্তরাধিকারী হবে। বাবা মরে গেলে ছেলেরা তাঁর সম্পত্তি পায়। কিন্তু তোমরা কি একবারও ভেবেছো যে
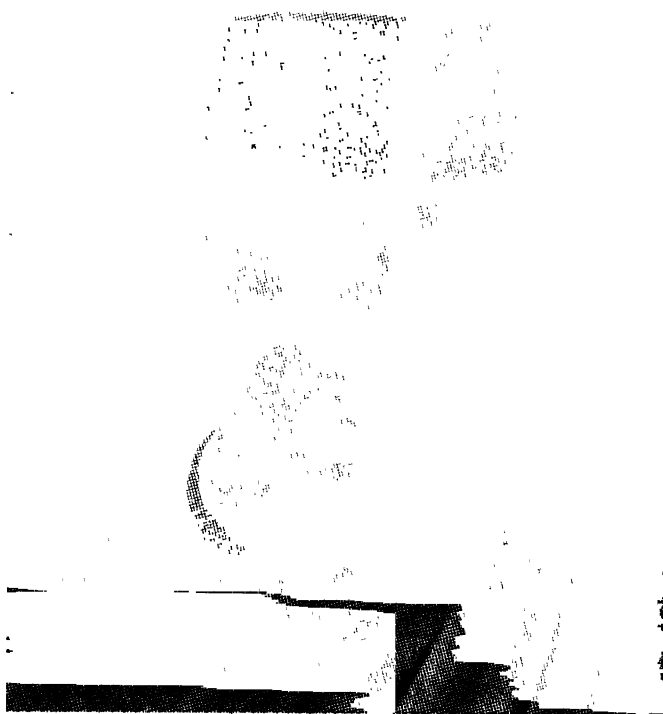
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

এঁরা আমাদের কি জিনিস দিয়ে গেছেন? ভারতের সন্তান হিসেবে তোমাদের কর্ত্তব্য হবে সেই আদর্শ সামনে রেখে জগত সভায় ভারতের স্থান আরও উঁচু করা।

ঈজিয়ন সাগরের সভ্যতা

খুব শৈশবে জার্মানীর হাইনরিশ স্লিমান তার বাবার কাছে শুয়ে শুয়ে ট্রয়ের বীরত্বের কাহিনী শুনত। সে সব বীরত্বের গল্প শুনতে শুনতে হাইনরিশ মুগ্ধ হ'য়ে যেত আর ভাবত যে বড় হ'য়ে সে গ্রীসে গিয়ে ট্রয় নগর খুঁজে বার করবেই করবে। তার জন্ম হয় মেকলেনবুর্গ গ্রামের এক গরীব পাদ্রীর ঘরে। কিন্তু গরীব বলে সে একটুও দমেনি। এ অভিযানে তার দরকার হবে অনেক টাকা পয়সা। এ সে জানত। তাই সে ঠিক করে যে আগে টাকা জমিয়ে তার পরে বেড়োবে ট্রয় খুঁজতে।

ট্রয়ের মজার ঘোড়া

ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। দেখতে দেখতে তার হাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক টাকা পয়সা জমে গেল। তখন তাকে পায় কে ? সে বেড়িয়ে পড়ল এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম অংশে ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে।
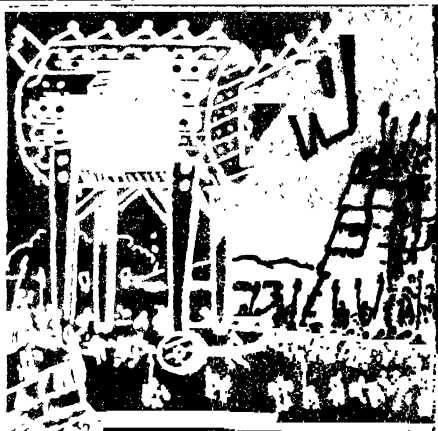
এশিয়া মাইনরের ঐ অংশ শস্যক্ষেতে ভরা। সেখানে এক বিরাট উঁচু ঢিবি দেখতে পাওয়া গেল। ওখানের সকলে বলত যে ওটাই ছিল ট্রয়ের রাজা প্রিয়ামুসের রাজবাড়ী।

উৎসাহের আধিক্যে আর মুহূর্ত্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে হাইনরিশ ঐ ঢিবি খুঁড়তে আরম্ভ করে দেয়। এত তাড়াতাড়ি তারা মাটী খুঁড়ছিল যে কখন যে তারা সত্যিকারের হোমারের বর্ণিত ট্রয় নগর খুঁড়ে শেষ করে আরও নীচে, আরও হাজার বচ্ছর আগের ট্রয় নগরীতে এসে পৌঁছেছিল সে দিকে তাদের মোটেই খেয়াল ছিল না।

আরও আশ্চর্য্যের কথা যে সেই মাটীর নীচে হাজার হাজার বছর আগের ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তারা সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি, দামী গহনাপত্র ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা ফুলদানী সব কুড়িয়ে পেল। সাধারণ পাথরের হাতুড়ী কি মাটীর বাসন পেলে কেউ আশ্চর্য্য হ'ত না—কারণ তত আগের দিনে গ্রীসের আদিম অধিবাসীরা আর কত জিনিষ আবিষ্কার করতে পারে?

শ্লিমান এ সমস্যার সমাধান করেন। তিনি অনেক গবেষণার পর বার করেন যে গ্রীকদের প্রায় হাজার বছর আগে ঐ অঞ্চলে অন্য এক সভ্য জাতি এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে শ্লিমান মিসিনী (Mycenae) প্রদেশের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যান। সেগুলো এত পুরানো যে রোমক ইতিহাসেও তাদের প্রাচীনত্বের সীমা দেওয়া নেই। সেখানেও এক পাথরের ঢাকনীর নীচে তিনি নানা গুপ্তধন আবিষ্কার করেন। স্থানীয় লোকরা বলত যে ওগুলো দেবতাদের তৈরী জিনিস। বহু পরীক্ষার পর সকলে বুঝতে পারে যে ওগুলো মোটেই দেবতাদের তৈরী নয়। আমার তোমার মত সাধারণ মানুষই সেকালে ঐ সব সুন্দর সুন্দর জিনিস বানিয়েছিল।

এরা ছিল কেউ নাবিক আর কেউ ব্যবসাদার। তারা থাকত ক্রীট দ্বীপে কিংবা ঈজিয়ন সাগরের মধ্যের অন্যান্য দ্বীপে। যেমন সুন্দর তারা নৌকা চালাত তেমনি বুদ্ধি ছিল তাদের ব্যবসা বানিজ্যের। সুসভ্য প্রাচ্যের সঙ্গে অর্দ্ধ সভ্য ইওরোপের জিনিসপত্তর লেনদেন এই সব বণিকদের মারফৎ হ'তে আরম্ভ করে।

বহু শতাব্দী ধরে ক্রীটের উপকূলে এই উন্নত সভ্যতার প্রচলন ছিল। তার প্রধান নগর ছিল ক্নোস্সুস (Knossus)! স্বাস্থ্য ও আরাম বজায় রাখবার জন্য শহরে যত কিছু করা সম্ভব ক্নোস্সুসের লোকরা তার কিছুই বাদ দেয় নি।

তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে যে ক্নোস্সুসের সভ্যতার অনেক কিছুই এখন সভ্য জগতে প্রচলিত হয়েছে। রাজপ্রাসাদে রীতিমত ড্রেনের বন্দোবস্ত ছিল আর প্রত্যেক বাড়ীতে আগুন জ্বালানো ষ্টোভের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়! তাছাড়া দৈনিক টবে বসে স্নান করারও প্রমাণ আছে। পৃথিবীতে

এরাই প্রথম টবে স্নানের আবিষ্কার করেছিল। রাজপ্রাসাদে যে কত আঁকা বাঁকা সিঁড়ি ছিল তার ইয়ত্তা নেই। প্রাসাদের নীচে ছিল ভাঁড়ার ঘরের বন্দোবস্ত। তাতে থাকত মদ, শস্য আর অলিভ তেল। সে সমস্ত ভাঁড়ার এত বড়
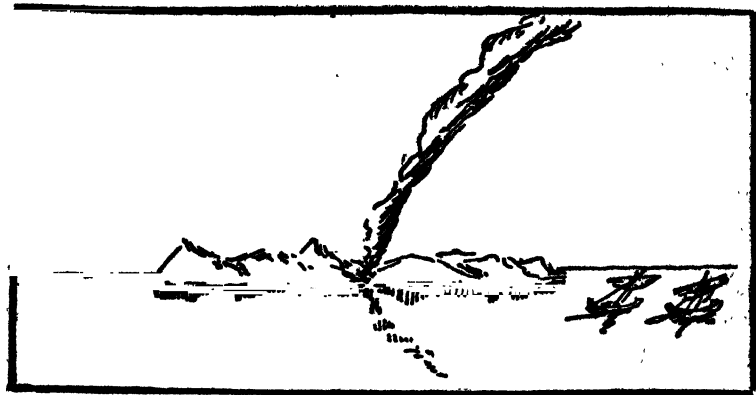
ক্রোস্থসের পতন

বড় হ'ত যে প্রথম প্রথম গ্রীক পরিব্রাজকরা সে সব দেখে হকচকিয়ে যেত। সে-জন্যেই তারা ওগুলোর নাম দেয় "গোলকধাঁধাঁ।"

ক্রোস্থসের সভ্যতা প্রায় মিশরেরই সমসাময়িক। ক্রমে ক্রমে ক্রোস্থসের সভ্যতার অনুকরণে আদিম গ্রীকরা নিজেদের সভ্য করতে থাকে এবং অবশেষে ক্রোস্থসের সভ্যতাকেই একেবারে ধ্বংস করে ফেলে।

ইওরোপের দীক্ষাগুরু গ্রীস

মিশরের পিরামিডের বয়স তখন হাজার বছরেরও বেশী আর বাবিলনের সম্রাট হাম্মুরাবির মৃত্যুও হয়েছে কয়েক শতাব্দী আগে। তখন একদল পশুপালক দক্ষিণ ইওরোপের দানিয়ুব নদীর তীর থেকে যাযাবর হ'য়ে শস্য শ্যামল মাঠের খোঁজে আরও দক্ষিণে সরে আসতে থাকে। এরাও হিন্দী-ইওরোপীয়দেরই এক

শাখা। ডিউক্যালিয়ন ও পিরহা'র সন্তান 'হেলেন'-এর নামানুসারে এরা নিজেদের বলত "হেলেনীয়।" এই আদিম হেলেনীয়দের সম্বন্ধে আমরা খুব সামান্যই খবর রাখি।

পশুপালন ছিল তাদের প্রধান জীবিকা এবং তাদের সভ্যতার স্তর ছিল 'জনযুগ'। কতগুলো 'জন' মিলে হ'ত 'বেরাদরী'—আবার কয়েকটি বেরাদরী মিলে হত 'কুল'—কতগুলো 'কুল' মিলে আবার কুল-সঙ্ঘও (Confederacy of Tribes) গঠিত হ'ত। মাতৃশাসন গিয়ে তখন আদিম গ্রীকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল পিতৃশাসন। বিভিন্ন 'জনে'র মধ্যে অদৃশ্য বাঁধন ছিল নানা রকমের। তাদের কয়েকটি জন একসঙ্গে মিলে হয়তো একই সাধারণ উৎসব করত। একই দেবতার আরাধনা করত তারা সবাই। কেউ মরে গেলে তাদের সবাইকে একই গোরস্থানে কবর দেওয়া হ'ত। প্রয়োজন হ'লে সবাই সবাইকে প্রাণপাত করেও রক্ষা করত। সমস্ত সম্পত্তি ছিল সাধারণের। পিতার দিক থেকে বংশ পরিচয় দেওয়া হ'ত। কেউ একই 'জনে'র ভিতর বিয়ে করতে পারত না। তবে কোন মেয়ে যদি বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হ'ত তাহলে কিন্তু তাকে আবার নিজেদের 'জনে'র মধ্যেই বিয়ে করতে হ'ত। কারণ তা না হলে বিয়ের পর যে তার সব সম্পত্তি অন্য 'জনে'র মধ্যে চলে যাবে, তখন কি হবে? সময়ে সময়ে বাইরের লোককেও জনের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হ'ত। 'জনের' সর্দ্দার হ'ত নির্ব্বাচিত এবং সকলে মিলে তাকে তাড়িয়েও দিতে পারত।

এ্যাটিকাতে ছিল এরকম চারটি কুল। তার প্রত্যেকটি ছিল আবার তিনটি বেরাদরীতে বিভক্ত এবং বিভিন্ন বেরাদরীতে থাকত কমপক্ষে তিরিশটি 'জন'!

গ্রীস জায়গা খুব ছোট হ'লেও সেখানে বিভিন্ন জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংগঠন নিয়ে থাকত।

হোমারের কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে গ্রীসের বিভিন্ন কুল মিলে তখন থেকেই ছোট ছোট 'জাতিতে' পরিণত হচ্ছিল। সে সব 'জাতির' ভিতর কিন্তু প্রত্যেকটি কুল, বেরাদরী তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে চলত। তারা থাকত দেয়ালে-ঘেরা নগরে নগরে। পশুরপাল বৃদ্ধির সঙ্গে তারা কৃষি কাজ ও

কারিকরী শেখে। তখন তাদের মধ্যে বংশবৃদ্ধি হ'তে থাকে। যতই তারা এই সমস্ত নানা অর্থকরী বিদ্যা শিখতে লাগল ততই তাদের মধ্যে দেখা দিল শ্রেণী বিভেদ। এই সব আদিম সাম্যতন্ত্রের ভিতর ক্রমে ক্রমে দেখা দিল বড় ছোটর বিভিন্ন দল। ছোট ছোট জাতিগুলি সবচেয়ে ভাল জমী আর অন্যের সম্পত্তি লুঠের জন্য ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকত।

নূতন দেশজয়ের সময় তাদের ভিতর সামরিক নেতার আবির্ভাব হয়। চাষ-বাসের জন্য সাধারণের জমী 'কুলের' সব পরিবারের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হ'ত। সেই জমী ভাগ করার সময় কুলের প্রধান লোকরা নিজেদের অংশে বেশী জমী রাখত। ক্রমে ক্রমে বেশী জমীর মালিক হ'য়ে এরা নিজেদের দেবতাদের অংশ থেকে উদ্ভূত বলে ঘোষণা করে অন্য সব গরীবদের কাছে থেকে সম্মান দাবী করত। প্রথম গ্রীক রাজারা ছিলেন শুধু এদের নেতা মাত্র।

প্রত্যেক গ্রীক রাজাকে ঘিরে এক মন্ত্রণা সভা থাকত। এই সভায় থাকত নানা বিভিন্ন 'জনে'র প্রধান প্রধান লোক। আরও পরে যখন প্রধানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল তখন প্রত্যেককে সভ্য না করে, তাদের সবাইর মধ্যে থেকে বেছে বেছে কয়জনকে মন্ত্রণা সভার সভ্য পদ দেওয়া হ'ত। এই ভাবে ধীরে ধীরে অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

যখনই কোনও বিশেষ জরুরী ব্যাপারের মীমাংসা দরকার হ'ত তখন মন্ত্রণা সভা 'জনপরিষদ' আহ্বান করত। কুল ও জনের প্রত্যেক পুরুষেরই এই পরিষদে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার সুযোগ থাকত। হাত দেখিয়ে প্রত্যেক প্রস্তাবের উপর মতামত নেওয়া হ'ত। একবার কোনও প্রস্তাব গৃহীত হ'লে সবাইকেই সে নির্দ্দেশ মেনে চলতে হ'ত। যতদিন পর্য্যন্ত 'জনে'র প্রত্যেক পুরুষকেই নির্ব্বিচারে যুদ্ধ করতে হ'ত ততদিন এই আদিম গণতন্ত্র সত্যিকারের কাজের ছিল। তখন সাধারণ লোকের সঙ্গে শাসকের কোনও পার্থক্য ছিল না।

সামরিক নেতা নির্ব্বাচনের ব্যাপারেও 'জনপরিষদের' প্রভাব ছিল অনেক। অনেক সময় গ্রীসের কোনও নেতার শূন্যপদ 'জনপরিষদের' মত নিয়ে তার

ছেলেকে দেওয়া হ'ত। কিন্তু তাই বলে মনে করো না যে আপনা থেকেই তখন কোনও নেতা মরে গেলে তার ছেলেই নেতা হ'তে পারত। ইলিয়াড্, ওডেসী প্রভৃতি পৌরাণিক কাব্যগ্রন্থ থেকে ঐতিহাসিকেরা স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন যে গ্রীসে তখনো 'রাজা'র কোনও অস্তিত্ব ছিল না। গ্রীসে যাদের বাসিলিউস (Basileus) বলা হত, তাঁদের এত ক্ষমতা ছিল না!

ক্রমে যতই গ্রীক সমাজে শ্রেণীভেদ বাড়তে লাগল, ততই 'জনযুগ' ভাঙতে লাগল। আগে শুধুমাত্র বিজিতদের দাসশ্রেণীভুক্ত করা হ'ত; কিন্তু ক্রমে দাসপ্রথা এমনভাবে চলন হ'ল যে এমন কি অন্য জনের লোককেও দাসে পরিণত করতে কারো দ্বিধা হ'ত না।

সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থার জন্য আর গরীবদের বিদ্রোহের হাত থেকে বড়লোকদের বাঁচাবার জন্য তখন সৃষ্টি হ'ল আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় শোষণের যন্ত্র—রাষ্ট্র!

অনেকে তোমাদের বলবে যে, রাজা-রাজরারা তো দেবতাদেরই অংশ। তাঁরা আপনা আপনি হয়েছেন, মানুষকে কিছু করতে হয় নি। সে কথা কিন্তু ঠিক নয়। রাজা বা রাজার রাজত্ব সবই আদিম যুগের সমাজ থেকে গড়ে উঠেছে। নানা দেশের উদাহরণ থেকেই সেটা ভাল করে বুঝেছো নিশ্চয়ই।

সেকালের গ্রীসের নানা রাজত্বের মধ্যে এ্যাটিকা ছিল একটি। তার রাজধানী ছিল এথেন্স ও বাসিন্দাদের নাম ছিল এথেনীয়। গ্রীক পুরাণের আমলেও এথেনীয়রা চারটি 'কুলে' বিভক্ত ছিল—তা আগেই বলেছি। এসব ভিন্ন ভিন্ন 'কুলের' বসতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। এমন কি যে সব বেরাদরী মিলে 'কুল' সৃষ্টি হ'ত, তারাও আলাদা আলাদা থাকত।

জমীজমা তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। কারও ছিল বেশী কারও কম। সেই সঙ্গে নানা রকমের কেনাবেচার জিনিসও মানুষ তৈরী করত এবং বর্ব্বর যুগের উচুস্তরের মত ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রচলিত ছিল। শাকসব্জী, মদ ও অলিভ তেলও এদেশের লোকরা তৈরী করতে জানত। ব্যবসা-বাণিজ্য

ও নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ঈজিয়ন সাগর থেকে ফিনিসীয়দের তাড়িয়ে দেয়।

জমীজমা যখন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল, তখন থেকেই গরীব লোক নিজের অভাব পড়লে জমী বন্ধক দিত কিংবা বিক্রী করত। তখন হয়তো বাইরের 'জনের' কেউ সেই জমি কিনত। তেমনি করে বাইরের কারিকর কুমোর কি ছুতোর হয়তো জিনিসপত্তর বেচতে বেচতে নিজের 'জন' ছেড়ে ভিন্ন 'জনের' দেশে বসবাস আরম্ভ করল। আগের যুগে যেমন প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন 'জন' শুধুমাত্র নিজেদেরই মধ্যে মেলামেশা করত এখন আর তা সম্ভব হ'ল না। হরদম বাইরে থেকে লোক এসে তাদের সঙ্গে মিশছে নয়তো তাদের থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে পেটের তাড়নায়।

শান্তির সময় প্রত্যেক 'বেরাদরী' বা 'কুল' স্বাধীন ইচ্ছেমত নিজেদের শাসন কাজ চালাতে পারত। যুদ্ধবিগ্রহের সময় এথেন্সের আদেশ মানতে হ'ত কেবল তাদের। বাইরে থেকে নানা রকমের যে-সব লোক এসে 'বেরাদরী' বা 'কুলের' ভিতর বসবাস আরম্ভ করল, তখন শাসন-ব্যাপারে তাদের মোটেই আমল দেওয়া হ'ত না। এতে যারা নতুন তাদেরও যেমন বিপদ আবার যারা পুরানো জনের ভিতরেই ছিল তাদেরও হ'ল তেমনি অস্বস্তি।

তারা স্থির করল যে পুরানো শাসন-ব্যবস্থা সংস্কার দরকার। থীসিয়ুস (Theseus) নামে একজন পণ্ডিত এক শাসনতন্ত্রের কাঠামো ঠিক করে দেন। তাঁর প্রধান সংস্কার হ'ল যে 'বেরাদরী' ও 'কুলের' হাত থেকে শাসনের অধিকার সরিয়ে এনে তিনি এথেন্সের শাসনের অধীন করেন। বিভিন্ন 'জন' ও 'বেরাদরী'র আইন ও আচার ব্যবহার সেখানে হ'ল অচল। নানা 'কুল' মিলে এথেনীয়রা এক 'জাতিতে' পরিণত হ'ল। নতুন শাসন-সংস্কারের ফলে এ্যাটিক জাতি ছাড়াও অন্য যে কোন জাতির লোকদেরই এথেন্সে এসে বসবাস করতে দেওয়া হ'ত।

থীসিয়ুসের আর এক দান হ'ল যে তিনি 'জন', 'বেরাদরী', 'কুল' নির্ব্বিচারে সমস্ত জাতিকে তিনভাগে ভাগ করেন—অভিজাত শ্রেণী, চাষী ও কারিকর। যারা

অভিজাত শ্রেণীর তাদের হাতে তিনি শাসনের ভার দিলেন। 'জনযুগে' যে সকলে সমান সমান ছিল, সে ব্যবস্থা এখন হ'ল অচল। সমাজের মধ্যে একদল হ'ল বিশেষ সুবিধাভোগী শাসকশ্রেণী, আর দু'দল পরস্পরের প্রতিযোগী চাষী আর কারিকর।

এর পর থেকে সোলোন (Solon)-এর আগে পর্য্যন্ত গ্রীসের ইতিহাস খুব সামান্যই জানা যায়। বাসিলিউস-এর পদ ততদিনে উঠে যায়। তার জায়গায় বিশেষ সুবিধাভোগী শাসকশ্রেণী থেকে নির্ব্বাচিত লোকরা দেশ শাসন করত। এঁদের বলা হ'ত 'আরকন' (Archon)। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল—ততই এঁরা গরীবদের উপর বেশী অত্যাচার আরম্ভ করেন। গরীবদের শোষণের দুটি পথ ছিল—টাকা ধার দেওয়া আর সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া।

অভিজাত শ্রেণী সাধারণতঃ এথেন্সের আশপাশেই থাকতেন। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য আর মাঝে মাঝে ডাকাতি করে তারা অনেক ধনসম্পদের অধিকারী হন। অভিজাত শ্রেণীর হাতে ধনসম্পদ বাড়তে লাগলে তাঁরা সেই টাকা সুদে খাটাতে আরম্ভ করেন। আগের জনযুগে টাকাই ছিল না—তাই সুদের কথাও কেউ জানত না। এখন অভিজাত শ্রেণী তাদের সুবিধামত মহাজনদের স্বার্থ বাঁচিয়ে নানা আইনকানুন তৈরী করলেন। এ্যাটিকা প্রদেশের যেদিকেই তখন তাকাও না কেন, খালি দেখবে যে প্রত্যেক মাঠের মধ্যে একটা করে খুঁটি পুঁতে তাতে লেখা রয়েছে ঐ জমী কার কাছে বন্ধক দেওয়া আছে। জমী সবই দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গিয়েছে। যে সব চাষীকে দয়া করে জমীতে থাকতে দেওয়া হ'ত তাদের উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ দিতে হ'ত জমিদারকে, আর বাকী একভাগে নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হ'ত। যদি জমী বিক্রী করেও ধারের টাকা শোধ করা না যেত, তাহলে চাষীর ছেলেমেয়েকে বিক্রী করে সে দেনা শোধ করতে হ'ত। সে তখন থেকে হ'ত 'দাস'। তারপরও ইচ্ছে করলে মহাজন চাষীকেই বিক্রী করতে পারত। এদেশে সভ্যতার প্রথম যুগে এমনি করে মানুষে মানুষের উপর অত্যাচার চালাত।

কিন্তু 'জনযুগের' শাসনের কাঠামোর মধ্যে এত সব নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের কোনই উপায় ছিল না। তাহলে কি করা যাবে? বেশ বোঝা গেল যে নতুন কোনও বন্দোবস্ত না করলে সমাজ ধ্বংস পাবে। সেই সময় অভিজাতশ্রেণী অন্যের অলক্ষ্যে দেশের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। গ্রামে ও শহরে যে সব কারিকর ও ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে উঠল তারা সকলেই নিজের নিজের স্বার্থের উপযুক্ত শাসনের কাঠামো বানিয়ে নিল। হাজার রকমের সরকারী কর্ম্মচারীর পদ সৃষ্টি করে এদের সবাইকে চাকুরী দেওয়া হ'ত। গরীবদের দাবিয়ে রেখে অভিজাতশ্রেণীর কথামত সবাইকে চালাতে হ'লে ও বিদেশ যুদ্ধ করতে হ'লে দরকার হচ্ছে একদল রীতিমত ভাড়াটে সৈন্য তৈরী করে রাখা। কারণ, আগের 'জনযুগে' প্রত্যেক লোকই ছিল যুদ্ধ করতে বাধ্য। কিন্তু এখন তো আর তা নেই। গরীবরা কেন অমনিতে বড়লোকের হুকুম তামিল করতে গিয়ে প্রাণ দেবে?

৫৯৪ খ্রীঃ পূর্ব্বে সোলোন গ্রীসের সামাজিক জীবনে বিপ্লব আনলেন। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত বিপ্লব ঘটেছে তার প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য হচ্ছে কোনও প্রচলিত বিধিব্যবস্থার হাত থেকে অন্য আর একরকম সম্পত্তি ব্যবস্থা বাঁচানো। একটি সম্পত্তি নষ্ট না করে অন্য সম্পত্তি বাঁচানো যায় না। এথেন্সের লোক যখন মহাজনদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠেছিল, তখন সোলোন মহাজনদের অত্যাচার বন্ধ করে দেন। তাঁর বিপ্লবের ফলে গরীবদের সম্পত্তি মহাজনের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচল। কি ভাবে যে এত বড় বিপ্লব ঘটল, তার খুব ভাল ইতিহাস নেই। তবে তাঁর নিজের লেখা অনেক কবিতা থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি সমস্ত বন্ধক দেওয়া জমী খালাস করে দেন ও যারা দেনার দায়ে বিক্রী হ'য়ে গিয়েছিল তাদেরও স্বাধীনভাবে দেশে ফিরে আসবার অধিকার দিয়েছিলেন।

এর বহুযুগ পরে যখন ফ্রান্সে ফরাসী-বিপ্লব হয়, তখন আগের সামন্তবাদী যুগের বড় বড় জমীদারদের সম্পত্তি ব্যবস্থা ধ্বংস পেল। সেখানে দেখা দিল আধুনিক কলকারখানা ও অন্য ধনতন্ত্রী সম্পত্তি ব্যবস্থা। আবার রুশ-বিপ্লবের

ফলে ধনতন্ত্রী সম্পত্তি ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে গরীব চাষী মজুরশ্রেণী তাদের সবাইকার মধ্যে সব সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করে নেয়।

সোলোনের আমলে যে সমস্ত ক্রীতদাস স্বাধীনভাবে দেশে ফিরে এল তাদের বাঁচানোর জন্যে নতুন নিয়মকানুন তৈরী হ'ল। ঠিক হ'ল যে তখন থেকে দেনার দায়ে কখনো মানুষ কেনাবেচা চলবে না। আর কে কত জমী দখল করতে পারবে তারও সীমা বেঁধে দেওয়া হ'ল।

আগের যে 'জনপরিষদ' ছিল (Council) তার আকার বাড়িয়ে দিয়ে চারশত প্রতিনিধির বন্দোবস্ত করা হ'ল। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন 'কুল' থেকে একশ করে প্রতিনিধি পাঠাত। প্রত্যেক চাষীর জমী ও ফসলের আয়ের অনুপাতে সমাজকেও চারভাগে বিভক্ত করা হ'ল। প্রথম তিনশ্রেণীর লোকের জমীর আয় হচ্ছে যথাক্রমে—৫০০, ৩০০ ও ১৫০ মেদিম্নোই (Medimnoy) শস্য (১ মেদিম্নোই হচ্ছে আমাদের দু'সেরের প্রায় সমান)। এর কমের সকলেই ছিল চতুর্থ শ্রেণীতে। এদের কোন বিশেষ অধিকার ছিল না। শুধু মাত্র 'জনপরিষদে' এসে এরা ভোট দিতে বা বক্তৃতা দিতে পারত।

দেশের সবচেয়ে ভাল ভাল সরকারী কাজের জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে লোক নেওয়া হ'ত। এছাড়া অন্যান্য কাজের জন্য উপরের বাকী দুই শ্রেণীর মধ্য থেকে লোক নেওয়া হ'ত। সংখ্যায় বেশী বলে 'জনপরিষদে' কিন্তু গরীবদের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল বেশী। 'জনপরিষদের'ই ভোট নিয়ে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হ'ত। সৈন্যদলেরও সংস্কার করা হয় তখন। প্রথম দুই শ্রেণীর লোক হ'ত অশ্বারোহী সৈন্য ; তৃতীয় শ্রেণীর লোক হ'ত ভাল ভাল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পদাতিক আর চতুর্থ শ্রেণীর লোক হ'ল শুধু সাধারণ সৈন্য। ক্রীতদাসের তখনও কোন অধিকার ছিল না।

সোলোনের আইনে অভিজাতশ্রেণীর অত্যাচার কমিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই তাঁরা সুযোগ খুঁজছিলেন কি করে আবার নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেন। গরীবদের শোষণ না করলে ধন সম্পত্তি বাড়বে কি করে?

সোলোনের মৃত্যুর পরে কিছুদিনের জন্য অভিজাতশ্রেণী আবার বড় হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু সে প্রভুত্ব বেশীদিন টিকতে পারে নি। পরে ৫০৯ খ্রীঃপূঃ ক্লাইসথেনিস-এর অধীনে এথেন্স বাসীরা আবার বিদ্রোহ করে অভিজাতশ্রেণী দমন করেছিল।

তিনি এক নতুন শাসন ব্যবস্থা তৈরী করলেন। তাতে সমস্ত এ্যাটিকা দেশকে একশটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয়। এ সব ছোট ছোট জেলাকে বলা হত 'দেমিস' (demes)। এক একটি শহরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকারী কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত করা হ'ত। এছাড়া আরও তিরিশ জন বিচারক নির্ব্বাচন করা হ'ত। দেমিস-এর সাধারণ লোকরা (demos) 'জনপরিষদে' একত্র হ'য়ে অন্য সব নির্ব্বাচন করত। দশটি দেমিস মিলে একটি 'কুল' গঠিত হ'ত। এ কুলের সঙ্গে কিন্তু 'জনযুগের' কুলের কোনও সম্পর্ক নেই। 'জনযুগে'র কুল ছিল রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত। আর এখন রক্তের সম্বন্ধের কোন বালাই ছিল না। এখনকার কুল হ'ল কতগুলো জায়গা নিয়ে। কুল ছিল স্বাধীন। সেই সব প্রত্যেক স্বাধীন কুল থেকে পঞ্চাশ জন করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হ'ত। এরকম দশটি কুল থেকে ৫০ জন করে নিয়ে পাঁচশো জন প্রতিনিধির জনপরিষদ গঠিত হ'ল। এই জনপরিষদই দেশ শাসন করত। সেখানে কোনও একজন লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল না। তোমরা হয়তো ভাববে—এই তো ভাল। তবে এ সুযোগ কেবল একচেটিয়া ছিল স্বাধীন নাগরিকদের জন্যই। ক্রীতদাসদের জন্য এ সুযোগ ছিল না। তারা ছিল সব কিছুরই বাইরে।

স্বাধীন নাগরিকরা সব সময় টাকা রোজগারের জন্য ব্যস্ত থাকত। তারা মোটেই পুলিশ ও সৈন্যের কাজে এগোতে চাইত না। পুলিশী কাজের জন্য ছিল ক্রীতদাস। এথেন্সের উন্নতি হবার মূলে ছিল এই বিরাট ক্রীতদাস শ্রেণী। এবার শোনো **গ্রীসের জীবনযাত্রা প্রণালীর** কথা।

জনপরিষদে সমস্ত স্বাধীন নাগরিকদের হাত তুলে ভোট দিতে হ'ত। মনে করতে পার যে, গ্রীসের সকলে যদি সামান্য পরামর্শ করতে হ'লে জন-

পরিষদে দৌড়ে আসত তাহলে তাদের সংসার পরিজনই বা কে দেখাশোনা করত আর কি করেই বা তারা রোজগার পত্তর করত ?

ক্রীতদাস বাদে যারা 'জনপরিষদে' ভোট দিতে পারত তাদেরই নাগরিক বলে। রাজ্য শাসন ও অন্যান্য সরকারী কাজের ভার ছিল শুধু নাগরিকদের উপর। বাকী সব কাজই করতে হ'ত ক্রীতদাসদের। একজন যদি নাগরিক হয় তো তার অধীনে থাকত অন্ততঃ ছয়জন ক্রীতদাস। প্রভুর জীবনধারণের জন্য যত কিছু কাজকর্ম্ম সবই করতে হ'ত ক্রীতদাসকে। প্রভু শুধু রাজ-কার্য্যই করতেন। শহরের প্রত্যেকের জন্যে রান্নাবান্না, আলো জ্বালানো এই সব কাজ ছিল ক্রীতদাসদের। তারাই ছিল দর্জ্জী, ছুতোর, কামার, স্যাকরা স্কুলের মাষ্টার, কেরাণী, ভাঁড়ারী, কারখানার মজুর। তাদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে যত সব থিয়েটারে বসে বসে ভাল ভাল নাটক দেখা—বা বড় বড় সভা সমিতিতে গিয়ে নানা নতুন নতুন কথা শোনাই ছিল প্রভুদের সময় কাটানোর উপায়। তখনকার এথেন্স ছিল ঠিক সেই রকম।

তবে ক্রীতদাস বলতে যেন মনে করো না যে তাদের উপর সব সময় অত্যাচার করা হ'ত। আমেরিকায় ক্রীতদাসদের উপর যে ভীষণ অত্যাচার করা হ'ত তার হৃদয় বিদারক বর্ণনা তোমরা 'টমকাকার কুটীর' (Uncle Tom's Cabin) নামে বইটিতে পাবে। গ্রীসের ক্রীতদাসরা অনেক সময় নিজের চেষ্টায় ইচ্ছে করলে উন্নতি করতে পারত। এমন কি গরীব এথেনীয়দের চেয়ে কোন কোন ক্রীতদাসের অবস্থা ছিল ভাল।

তাছাড়া ঘরসংসারের কাজ গ্রীসে ছিল নাম মাত্র। বাড়ীঘর ছিল খুব সাধারণ। বড় বড় লোকদের বাড়ীও দেখলে মনে হ'ত সামান্য গোলাঘরের মত। তাতে বর্ত্তমানের সৌখীনতার এত সাজ সরঞ্জাম থাকত না। বাড়ীতে থাকত মাত্র চারটে দেয়াল আর ছাত। কোন ঘরেই জানালা ছিল না। শুধু একটি দরজা দিয়ে আসা যাওয়া করতে হ'ত সবাইকে। বাড়ীর মধ্যে একটি আঙ্গিনার চারপাশ ঘিরে থাকত রান্নাঘর, খাবার আর শোবার ঘর। আঙিনায় থাকত ঝরণা ; তার পাশে পাষাণের সব মূর্ত্তি। উঠোনের এক

কোণায় বসে রান্না করত কোনো ক্রীতদাস। আর একজন অন্য কোণায় বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াত।

তাদের খাওয়াও ছিল খুব সামান্য। গ্রীসের লোকরা নেহাৎ না খেলে নয় বলেই যেন খাবার খেত। রকমারী খাবারের বহর ছিল না তাদের। শুধু মাংস, কাঁচা তরকারী, রুটি ও মদই ছিল বেশীর ভাগ লোকের খাবার।

পোষাক পরিচ্ছদেও তারা খুব হিসেবী ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ছিল তাদের আর এক গুণ। কি করে নানা রকম ব্যায়াম করে শরীর সুস্থ রাখতে হয়, সাঁতার কাটতে হয়, দৌড়ঝাঁপ করতে হয়, সে বিষয়ে তারা ছিল অসাধারণ নিপুণ। গ্রীসের লোকরা কোন বিষয়েই বেশীর ভাগ কিছু করা পছন্দ করত না। সব বিষয়েই তারা মাঝামাঝি পথে চলত। তারা সব কাজের ফাঁকে চাইত শুধু অবসর। কাজেই কখনো সবাই সৌখীনতায় মত্ত হ'ত না—যাতে একটুও বাড়তি সময় নষ্ট না হয়।

অবসর বিনোদনের জন্য তারা **থিয়েটার** আবিষ্কার করে। কোরাস গানে কি করে তাদের পূর্ব্বপুরুষরা গ্রীসের আদিম অধিবাসী পেলাসজীয়দের (Pelasgean) যুদ্ধে হারিয়ে গ্রীস দখল করেছিল সেই সব ছড়া সকলে একসঙ্গে জড়ো হ'য়ে শুনত।

প্রত্যেক বছর গ্রীসের লোকরা এক হ'য়ে মদের দেবতা ডিয়োনীসাস (Dionysus) এর উপাসনা করত। মদের দেবতা দ্রাক্ষাবনে থাকতেন। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল আদ্ধেক মানুষ আর আদ্ধেক ছাগল। কাজেই উৎসবের সময় লোকরা ছাগলের চামড়া গায়ে দিয়ে ম্যা ম্যা করে নানা রকম নাচ করত। গ্রীস ভাষায় ছাগলের নাম হচ্ছে 'ট্র্যাগোস' (Tragos) এবং গায়কের গ্রীক শব্দ হচ্ছে 'ওইডোস' (Oidos)। কাজেই যে গায়ক ছাগলের চামড়া গায়ে দিয়ে ম্যা ম্যা করত তাকে গ্রীসের লোকরা বলত 'ট্রাগোস—ওইডোস'। এই শব্দ থেকে ক্রমে বহুযুগ পরে ইংরাজী 'ট্র্যাজেডী'

কথার উদ্ভব হয়েছে। যে সব থিয়েটারের শেষে খুব দুঃখের কিছু থাকে—তাকে বলা হয় 'ট্র্যাজেডী'। আর যার শেষ খুব আনন্দের তাকে বলা হয় 'কমেডী'।

প্রথম প্রথম দল বেঁধে গান করাটা ছিল খুবই মজার ব্যাপার। কিন্তু কিছুদিন পরেই লোক একই গান শুনতে শুনতে বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তারা নতুন কিছু শুনতে চাইল। একজন কবি তখন নতুন ব্যবস্থা করলেন। দলের মধ্য থেকে একজন একটু এগিয়ে এসে অন্য সবাইর সঙ্গে নানা রকম কথাবার্ত্তা বলতেন। কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানা রকম অঙ্গভঙ্গীও করতেন। এই রকম জোড়াতালি দেওয়া কথাবার্ত্তাই পরে নাটকের সংলাপ (dialogue) আকার নেয়।

পরের যুগে 'এসকাইলাস' নামে নাট্যকার একজনের বদলে দুইজন লোকের মধ্যে 'সংলাপ' দিয়ে নাটক শুরু করেন। তারপর 'ইউরিপিডিস্‌' আরও উন্নত নাটক লিখেছিলেন। ক্রমে এ্যারিষ্টোফেনিস ও অন্যান্য নানা নাট্যকার গ্রীসের বিরাট নাট্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। দেখতে দেখতে প্রত্যেক পাহাড়ের গা কেটে নানা শহরে থিয়েটার ঘর বানানো হয়। দর্শকরা সবাই সামনে বসতেন। আর সম্মুখে অর্দ্ধবৃত্তাকারে একটা উঁচু জায়গায় গায়করা নাচগান করত। তাদের পিছনে একটি তাঁবু থাকত। সেই তাঁবু থেকে তারা সাজগোজ করে মঞ্চে এসে দাঁড়াত। গ্রীক ভাষায় তাঁবুকে বলা হয়—'স্কিন' (Skene)। তা থেকেই আমরা এখন বলি ষ্টেজের সীন, (Scene) সিনারী। গ্রীকরা বহুদিন **পারসীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ** করেছিল।

ফিনিসীয়দের শিষ্য ঈজীয়দের কাছে গ্রীকরা ব্যবসা বানিজ্য শিখেছিল। ঠিক ফিনিসীয় ঢঙ্‌-এ তারা উপনিবেশও স্থাপন করত। ঐ ভাবে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরের উপকূলে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল গ্রীকরা।

এদিকে পারসীয় সম্রাটরা ক্রমে সাম্রাজ্য বাড়াতে বাড়াতে গ্রীকদের সীমান্তের কাছে এসে পড়েছিল। তখন গ্রীকদের বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য তারা আহ্বান জানাল। গ্রীকরা সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। ফিনিসীয়রা

গ্রীকদের বিরুদ্ধে পারসীয়দের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ফিনিসীয়দের জাহাজে চড়ে পারসীয় সৈন্যরা গ্রীসদেশ জয় করতে আসে। কিন্তু আথেস (Athes) পর্ব্বতের কাছে এলে ভীষণ ঝড়ে ডুবে বহু পারসীয় সৈন্য প্রাণ হারায়।

পারসীয়রা এতেও হতাশ না হ'য়ে দুবছর পর আবার ঈজিয়ন সাগর পার হ'য়ে ম্যারাথন নামক এক গ্রামে অবতীর্ণ হয়। সেই সংবাদ পাবামাত্রই এথেনীয়রা দশহাজার সৈন্য পাঠিয়ে সমস্ত পাহাড় রক্ষা করতে চাইল আর চারদিকে লোক পাঠিয়ে সৈন্য ভিক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কেউ এথেন্সকে সাহায্য করতে রাজী হ'ল না। বাধ্য হ'য়ে এথেন্সের সেনাপতি 'মিলটিয়াডিস্' পারস্যের বিরাট সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের সামান্য সেনাদল নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলেন। গ্রীকদের অমিত বিক্রমের কাছে পারসীয়রা বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। তারা পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করে।

দেখতে দেখতে আট বছর কেটে গেল। আবার পারসীয় সৈন্যরা উত্তর গ্রীসের থেসালী (Thessaly) প্রদেশে উপস্থিত হ'ল। গ্রীসের সব চেয়ে বড় যোদ্ধার জাত স্পার্টানদের অধীনে সমস্ত গ্রীস পারসীয়দের বাধা দিল। কিন্তু স্পার্টানগণ গ্রীসের গিরিপথ গুলি তেমন ভাল ভাবে রক্ষার চেষ্টা তখনো করেনি। লিওনিডাস নামে বীর যোদ্ধা সামান্য কয়েকশত সৈন্য নিয়ে গিরিপথ পাহারা দিচ্ছিলেন। শত শত পারসীয়দের আক্রমণও তাঁকে হটাতে পারেনি। কিন্তু একজন বিশ্বাসঘাতক গ্রীক পারসীয়দের পথ দেখিয়ে লিওনিডাসের পিছনে নিয়ে আসে। থার্ম্মপলির নিকটে তখন এক ভয়ানক সংগ্রাম হয়। তাতে লিওনিডাসের সমস্ত সৈন্যবাহিনী প্রাণ হারায়। গিরিপথ পারসীয়রা দখল করে নেয়। দেখতে দেখতে পারসীয়রা থার্ম্মপলি দখল করে সমস্ত এথেন্সের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে থাকে। গ্রীকরাও কিন্তু সর্ব্বদাই প্রতিশোধের উপায় খুঁজছিল। একবছর পরেই থেমিষ্টোক্লিস এর অধীনে গ্রীক নৌবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে পারস্য সম্রাট জারেক্সেসকে গ্রীস ত্যাগ করে পালিয়ে আসতে হয়।

পারসীয়দের যুদ্ধের পরে বহুদিন ধরে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে গৃহযুদ্ধ হয়। কে গ্রীসের নেতৃত্ব করবে তাই ছিল ঝগড়ার বিষয়।

দিনের পর দিন যখন ঐ ভাবে এথেন্স ও স্পার্টার গৃহযুদ্ধে শক্তিক্ষয় হচ্ছিল তখন উত্তরে মাসিডোনীয়াতে ফিলিপ্ নামে একজন সুযোগ্য সম্রাট রাজত্ব করছিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রীসের সম্রাট হ'য়ে তিনি স্পার্টা ও এথেন্সের বিবাদ মেটান। গ্রীসদেশ এক করে তিনি চাইলেন পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযান করে গ্রীস বিজয়ের প্রতিশোধ তুলতে। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয়নি। আশা পুর্ণ হবার আগেই তিনি আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। সে দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর সুযোগ্য ছেলে আলেকজান্দারের উপর।

আলেকজান্দার ছিলেন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ মনীষি এ্যারিষ্টট্লের শিষ্য। ৩৬৪ খ্রীঃ পুর্ব্বে তিনি ইওরোপ ছেড়ে মাত্র সাত বছরের মধ্যে ভারত পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ বিজয় করেন। ফিনিসীয়দের পদদলিত করে বহুদিনের প্রতিষ্ঠা বন্ধ করে দেন। নীলনদের উপত্যকার উপর উড়ত তাঁর বিজয়কেতন। বিরাট পারস্য সাম্রাজ্যের দর্প তাঁর কাছে খর্ব্ব হয়েছিল। বাবিলন শহর জয় করে আবার তিনি নতুন করে নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন।

সমস্ত দেশ জয় হ'য়ে গেলে তিনি আদেশ দিলেন বিজিত দেশে গ্রীক সংস্কৃতি প্রচার করবার। প্রত্যেক সৈন্য তখন হ'য়ে পড়ে এক একজন শিক্ষক। তাদের কাজ হ'ল নতুন দেশের লোককে তাদের ভাষা শেখানো। দিনের পর দিন গ্রীক সংস্কৃতি নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। এমনি সময় ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ কয়েক-দিনের জ্বরে আলেকজান্দারের মৃত্যু হয়। মরবার সময় তিনি ছিলেন বাবিলনের হাম্মুরাবির রাজপ্রাসাদে।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আলেকজান্দারের বিশাল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরল। বড় বড় সেনাপতিরা সমস্ত রাজ্য নিজেরা ভাগাভাগি করে নিল। আরও অনেকদিন নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখবার পর তারা ক্রমে রোমানদের অধীনে আসে।

পরাজিত হ'লেও গ্রীকদের সংস্কৃতি পৃথিবীতে বিখ্যাত হ'য়ে আছে আজও। ফিনিসীয় বণিকদের প্রচলিত অক্ষরমালা বদলে এঁরাই ইওরোপে লেখার পদ্ধতি প্রচলন করেন। হোমারের মহাকাব্য থেকে ইওরোপে সাহিত্যের সূচনা। গ্রীক সাহিত্যের আদর আজও কমে নাই। গ্রীক শিল্পও ছিল
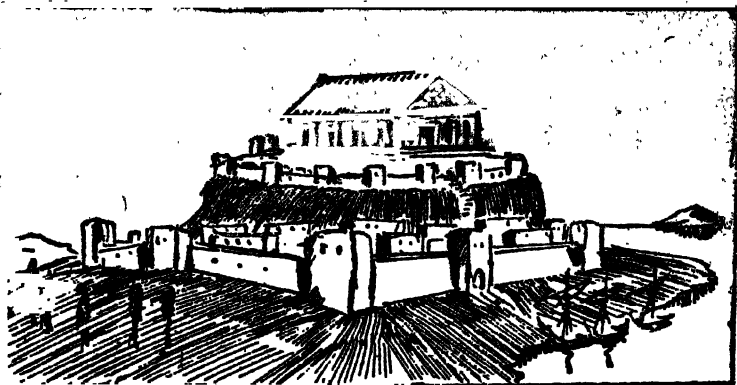
গ্রীসের ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র (City States)

অসাধারণ উন্নত। গ্রীক দর্শন থেকেই ইওরোপীয় চিন্তাধারার সৃষ্টি। সক্রেটিস, প্লেটো, ডিমোক্রিটাস, হিরাক্লিটাস—এঁরা সকলেই ছিলেন তখনকার জগতের শ্রেষ্ঠ মণীষী। ইউক্লিড জ্যামিতি রচনা করেন। আর্কিমিডিস ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার প্রবর্ত্তন করেন।

কিন্তু এত হ'লে কি হয়, সে সমাজে নারীর সমাদর ছিল না। দাসত্বকে সবাই প্রকৃতির বিধান বলে মানত। সাধারণ লোককে ভুলিয়ে রাখতে ধর্ম্মের উন্মাদনা, ডিওনীসাসের পূজা প্রভৃতি অনেক সংস্কারও প্রচলিত ছিল।

গ্রীসের যখন দুর্দিন এসেছিল তখন তুরস্কের সুলতানরা গ্রীস জয় করেছিল। তুরস্কের অধীনতার বন্ধন মোচন করবার জন্য গ্রীসের জাতীয়তাবাদীরা বিদ্রোহ করেছিল। সেই বিদ্রোহে সাহায্য করতে গিয়ে ইংরাজ কবি বায়রণ গ্রীসে প্রাণ হারান।

ইতিহাসের চাকা খালি ঘুরছে। তাই তুরস্কের সুলতানের আবার দুর্দিন এল ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর। সেই যুদ্ধে তুরস্ক ছিল জার্মানীর পক্ষে। জার্মানী পরাজিত হ'লে তুরস্কেরও পতন হয়। সেই সুযোগে ইংরাজদের সাহায্যে গ্রীস কয়েকটি জায়গা দখল করবার চেষ্টা করে।

এতে সমস্ত তুরস্কের উপর দিয়ে জাতীয়তার বন্যা বয়ে যায়। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের নব জাগরণ হ'ল। গ্রীস ও ইংরাজদের চক্রান্ত হয় বিফল।

এর পর থেকে গ্রীসে শুধু রাজা আর প্রধান মন্ত্রীর কঠোর শাসন চলে। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে পর ইওরোপে সাম্যবাদের বন্যা আসে। সেই বন্যা ঠেকানর জন্য গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী ভেনিজেলস দেশের মধ্যে চাষী মজুরের সব রকমের আন্দোলন বন্ধ করে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর মেটাক্সাস হন গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী। তিনি পুরোপরি ফ্যাসিস্ট পন্থায় গ্রীস শাসন করতেন। দেশের গরীবদের অবস্থা তখন দিন দিন খারাপ হ'তে থাকে। জনসাধারণও শাসনকর্ত্তাদের উপর বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

এমনি করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এগিয়ে আসে। হিটলার তখন গ্রীস আক্রমণ করে জয় করেন। গ্রীস জার্মানীর পদানত হ'লেও স্বাধীনতাকামী বীর গ্রীকরা নীরবে হিটলারের অত্যাচারের কাছে মাথা নোয়ায় নি। গ্রীসে অনেক ছোট ছোট পাহাড়, বন, জঙ্গল আছে। তারই ভেতরে লুকিয়ে থেকে আবাল বৃদ্ধ বণিতারা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল। দেশের যত দল ছিল তারা সবাই একসঙ্গে মিলে এক জাতীয় দল গড়ে তোলে। গ্রীক ভাষায় তার নামের প্রথম অক্ষরগুলো হ'ল—E. A. M ; এই E. A. M. এর সৈন্যদলের নামের প্রথম অক্ষর হচ্ছে E. L. A. S.। বহুদিন গোপনে গোপনে জার্মানীর বিপক্ষে এরা যুদ্ধ চালায়। তারপরে সোভিয়েট সৈন্যের কাছে জার্মানীর সৈন্যরা যখন হারতে থাকে তখন তারা ইংরাজদের সহায়তায় গ্রীস থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু যারা ছিল রক্ষক তারাই জার্মানদের তাড়িয়ে হ'ল ভক্ষক। ইংরাজরা গ্রীসের যত ধনীদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে এমন

এক সরকার স্থাপন করতে চাইল যাতে E. L. A. S. দের কাউকেই নেওয়া হয় নি। কাজেই গ্রীসের জনসাধারণের সঙ্গে ইংরাজদের পরিচালনায় গ্রীসের ধনিকদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। কিছুদিন হ'ল কমিউনিস্ট নেতা সিয়ানটোসের পরিচালনায় দুপক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে।

দিগ্বিজয়ী রোম

ইটালীর অধিবাসীরা জাতিতে লাটিন। কিম্বদন্তী আছে যে একশো লাটিন 'জন' মিলে একটি 'কুল' গঠিত হয়েছিল। তার সঙ্গে পরে এসে মিশেছিল আবেলীয় কুলের আরও একশো 'জন'। পরে আরও অনেক ধরণের প্রায় একশোটি 'জন' এসে এদের সঙ্গে যোগ দেয়। 'জন' ও 'কুলের' মধ্যের যে স্তরকে 'বেরাদরী' বলা হয় তাকে রোমের লোক বলত 'কিউরিয়া'। দশটি 'জন' মিলে হ'ত একটি 'কিউরিয়া'।

রোমের 'জন' ও গ্রীসের কি অন্যান্য জায়গার 'জনের' মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। রোমের 'জনের' কেউ মরে গেলে তার সম্পত্তি সেই 'জনের' মধ্যে ভাগ হ'য়ে যেত। গ্রীসের মত 'জনের' মধ্যেও পিতৃশাসন প্রচলিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে 'জনের' মধ্যে এক বিবাহ প্রথা প্রচলিত হ'ল ও লোকের ধন সম্পত্তি বাড়তে লাগল। তখন বহু নতুন নতুন আইন কানুনও তৈরী হ'ল। প্রত্যেক 'জনের' জন্য বিশিষ্ট গোরস্থানও নির্দিষ্ট ছিল। কেউ মরে গেলে অন্য কোথাও কবর দেওয়া হ'ত না। সবাইকে বিয়ে করতে হ'ত জনের বাইরে। জমী ছিল প্রধানতঃ 'জনের' অধিকারে—দু এক ক্ষেত্রে পরিবার হিসেবেও লোককে জমী নিয়ে বসবাস করতে দেখা যেত। একে অন্যের জন্যে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করত না। 'জনে'র লোকদের বাইরের আক্রমণ থেকে পরস্পরকে রক্ষা ও সাহায্য করা ছিল বাধ্যতামূলক। অপরিচিত লোককেও জনের ভেতর নিয়ে নেওয়া হ'ত। গোষ্ঠীর নেতা অন্য সব জায়গার মতই নির্ব্বাচিত হ'ত। তবে প্রধানত একই পরিবারের লোককে বেশীরভাগ সময় নির্ব্বাচনের সুযোগ দেওয়া হ'ত।

রোমের লোক (Populus Romanus) বলতে শুধু প্রথমে যে তিনটি কুলের কথা বলা হয়েছে তারই সভ্যদের বোঝায়। এদের নিজেদের শাসনকার্য্য চালাবার প্রধান অঙ্গ ছিল 'সিনেট'। তিনশটি 'জনের' নেতাদের নিয়ে এই সিনেট গঠিত হ'ত। নেতারা প্রায় একই পরিবার থেকে নির্ব্বাচিত হওয়ায় শাসন কর্ত্তারা ক্রমশঃই একটি অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। ক্রমে এই পরিবারগুলি নিজেদের প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত শ্রেণী বলে অন্যদের চাইতে বিশেষ সুযোগ সুবিধা আদায় করতে থাকে।

কিন্তু নতুন কোনও আইন কানুন করতে হ'লেই 'জন-পরিষদ' (Comitia Curiata) থেকে সেটা পাশ করিয়ে নিতে হ'ত। রাজ্যের বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী এমন কি 'রেক্স' (রাজা) ও এরাই নির্ব্বাচন করত। যুদ্ধ করতে হ'লেও জনপরিষদের মত নিতে হ'ত। আবার, যত মামলা মোকদ্দমা হ'ত তার আপীল করা হ'ত জনপরিষদের কাছে। রাজার পদ বংশ পরম্পরাগত ছিল না। ইচ্ছে করলে লোক 'রেক্সকে' তাড়িয়ে দিতে পারত।

ধীরে ধীরে রোম নগরের লোক সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাইরের অনেক লোকও এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাছাড়া আশপাশের গ্রাম ও নগরও রোমের দখলে আসে। বাইরে থেকে যে লোকজন রোমে আসত তাদের সব-রকম স্বাধীনতাই ছিল। ইচ্ছে করলে তারা রোমে জমী কিনতে পারত। খাজনা থেকে তাদের রেহাই ছিল না, প্রয়োজন হ'লে তাদের যুদ্ধেও যেতে হ'ত। কিন্তু তবু তারা খাঁটি রোমের লোক বলে গণ্য হ'ত না। সরকারী কাজ ও বিজিত দেশের লুণ্ঠিত জিনিসপত্তরের ভাগ তাদের দেওয়া হ'ত না। এদের বলা হ'ত প্লিবিয়ান (Plebean) বা সাধারণ লোক। রোমের ইতিহাসে প্লিবিয়ান ও প্যাট্রিসিয়ান—গরীব আর অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে নিয়ত সংঘর্ষ লেগেই থাকত।

যতই দিন যেতে থাকে—ততই প্লিবিয়ানরা ব্যবসা বাণিজ্যে এগিয়ে যেতে থাকে। ক্রমে প্লিবিয়ানদেরই ধনসম্পদ হ'ল বেশী। এই দুই দলের সংঘর্ষের ফলেই রোমে আরো ভাল নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন হয়।

গ্রীক সংস্কারক সোলোন-এর অনুকরণে রোমেও জনগণের পরিষদ সৃষ্টি হয়। এতে ঢোকবার জন্যে প্লিবিয়ান কিংবা পপুলাস-এর বাছ বিচার ছিল না। সৈন্যদলে যারাই যোগ দিত তারাই ইচ্ছে করলে জনপরিষদের সভ্য হ'তে পারত। যারা অস্ত্র ধরতে পারত—এমন সবাইকে তাদের আয় অনুপাতে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। যাদের আয় বছরে দশ হাজার টাকার বেশী তারা হ'ল প্রথম শ্রেণীর লোক, এমনি ভাবে সাড়ে ছয় হাজার টাকা আয়ের লোক হ'ল দ্বিতীয়, সাড়ে চার হাজার টাকা আয়ের তৃতীয়, দেড় হাজার টাকা আয়ের চতুর্থ, ও হাজার টাকা আয়ের লোক হ'ল পঞ্চম শ্রেণী। ষষ্ঠ শ্রেণীতে রইল সর্বহারা শ্রেণী। তাদের যুদ্ধে যাওয়া বা খাজনা কিছুই দিতে হ'তনা।

আগের কিউরিয়া পরিষদের যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল তার সব প্রধান প্রধান অধিকার গুলোই নতুন জনপরিষদ নিজের হাতে তুলে নেয়। কিউরিয়া পরিষদের আর কোনই কাজ করার রইল না। কালক্রমে কিউরিয়া পরিষদই উঠে গেল।

আগের জন পরিষদে একই রক্তের সংস্পর্কের জনের লোকজন ছাড়া অন্যের বসবার অধিকার ছিল না। কিন্তু এখানে সে ব্যবস্থা উল্টে গেল। রক্তের সম্পর্কের আর দরকার হ'ল না। একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গা নিয়ে যারা বাস করত তাদের নিয়ে নতুন ধরণের 'জন' সৃষ্টি হ'ল।

রোমে তাড়াতাড়ি লোকজন বাড়ছিল আর বাইরের হাজার রকমের লোকজন সদা সর্ব্বদা এসে জনের মধ্যে বসবাস করায় আগের রক্তের সম্পর্কের গড়া 'জনে'র লোকদের সঙ্গে এদের কাজ কারবারের অনেক অসুবিধা হ'ত। সে জন্যেই দরকার হ'ল রক্তের সম্পর্ক ভুলে অন্য ব্যবস্থা করা। নতুন শাসন সংস্কারের ফলে রোমে রক্তের সম্পর্কের জনযুগ ভেঙে গিয়ে তৈরী হ'ল—এক একটি জায়গার ভিত্তিতে 'জন'।

রোম যখন নবীন উদ্যমে এগিয়ে চলছিল তখন শুরু হ'ল **রোম আর কার্থেজের** প্রতিযোগীতা।

আফ্রিকা ও ইওরোপের মধ্যে যে সমুদ্র আছে তারই একপারের পাহাড়ের গায়ে ফিনিসীয়দের ব্যবসা বাণিজ্যের বড় বন্দর ছিল। সে বন্দরের নাম হ'ল

কার্ট-হাদ্‌সাট (Kart-Hadshat)। একেই বলা হয় 'কার্থেজ'। দেখতে না দেখতে বন্দরটির শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগল আর তার ঐশ্বর্য্যের কোন সীমা পরিসীমা রইল না। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন নেবুকাদ্‌নেজ্জার বাবিলনের সম্রাট তখন কার্থেজ বন্দর স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

এই বিরাট বন্দরে হাজারে হাজারে জাহাজ রোজ আনাগোনা করত। কার্থেজের নৌশক্তির সঙ্গেও তখন অন্য কোন জাতি পেরে উঠ্‌ত না। কিন্তু দুঃখের কথা যে বন্দরটি ও আশপাশের দেশ বিদেশের উপর কর্তৃত্ব করত
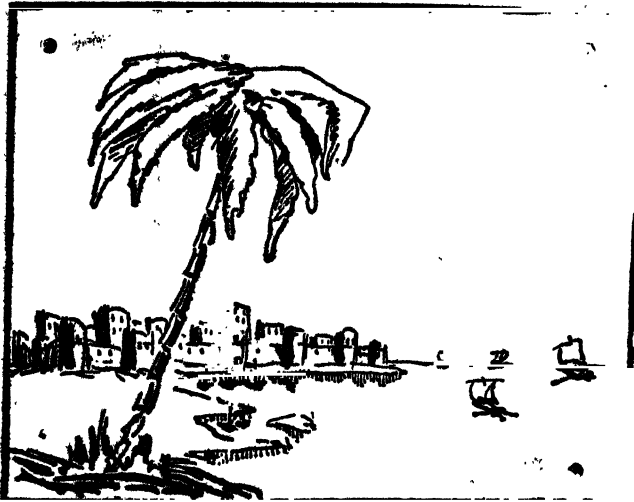
কার্থেজ

কেবল্ মাত্র কয়েকজন বড় লোক। ঐশ্বর্য্যের গ্রীক শব্দ হচ্ছে প্লুটোস্ (Ploutos), গ্রীকরা তাই বড় লোকদের শাসনকে বলত প্লুটোক্র্যাসী। কার্থেজ ছিল এমনি এক প্লুটোক্র্যাসী।

যত দিন যেতে লাগল চারপাশের দেশের উপর কার্থেজের প্রভাব ততই বাড়তে লাগল। ক্রমে আফ্রিকার সমস্ত উপকূল ও ফ্রান্সের কতক অংশ কার্থেজের অধীনতা স্বীকার করে ও নিয়মিত কর দিতে বাধ্য হয়।

দেশে যেমন বড়লোকরাই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা তেমনি গরীবরা সুযোগ পেলেই আবার মাথা উচু করতে ছাড়ত না। তবে সাধারনতঃ গরীব লোকরা নিয়ম মত খেতে পড়তে পেলেই সন্তুষ্ট থাকত—তার বেশী কিছু চাইত না। গরীবদের শান্ত করে ভুলিয়ে রেখে কার্থেজের অভিজাত শ্রেণী প্রায় পাঁচশো বছর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেছিল।

এমন সময় তাদের কানে এক গুজব এল যে ইতালীর পশ্চিম অংশে রোম নামে একটি নগর নাকি শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও অর্থ সম্পদে ভীষণ বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছে। নিজেদের ক্ষমতাহানির ভয়ে কার্থেজের শাসন কর্ত্তারা তখন চাইল সেই নবীন দেশকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে।

গ্রীকদের মতই বেশী কথা না বলে রোমের লোকরা নীরবে নিজেদের শাসন চালাত। জনসাধারণের (প্লিবিয়ান) মনের ভাব তারা অনেক ভালভাবে বুঝতে পারত। তাই প্রত্যেক নগরের শাসনভার তারা দুজন কনসালের উপর ছেড়ে দিত। তাদের বুদ্ধি দেবার জন্যে ছিল এক প্রৌঢ়দের সমিতি। তাকে সিনেট বলত। সিনেট কথাটি আসে 'সিনেক্স' (Senex) শব্দ থেকে। এর মানে বয়োবৃদ্ধ লোক।

এথেন্সের লোকরা যেমন গরীব আর বড় লোকদের সংঘর্ষের জন্য অবশেষে বাধ্য হয়ে ড্রাকো ও সোলোনের আইন তৈরী করেছিল রোমেও তেমনি বিদ্রোহ প্রায়ই দেখা দিতে থাকে। গরীবরা তখন 'ট্রিবিউন' (Tribune) প্রতিষ্ঠা করে। সমস্ত প্লিবিয়ানদের মধ্যে থেকে এই ট্রিবিউন নির্ব্বাচন করা হ'ত। কোন রাজকর্ম্মচারী কারও উপর অত্যাচার করলে ট্রিবিউন সেই লোককে বাঁচাতে পারত। ট্রিবিউনের কর্ত্তা কনসালরা ইচ্ছে করলে লোককে ফাঁসির হুকুম দিতে পারতেন। যদি সেই হতভাগার ভাল করে বিচার না হয় তাহলে ট্রিবিউন তাকে ফাঁসীর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিতেন।

রোম বলতে মনে করো না যে শুধু রোম নগরের কথা বলছি। সত্যি কথা বলতে গেলে রোমের চারপাশের যত প্রদেশ ছিল তাদের নিয়েই হচ্ছে রোমের যত জারিজুরী। কোন দেশ জয় করলে রোম তাদের স্বাধীনতা

কেড়ে নিত না। বিজিত দেশ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় রোমের সঙ্গে যোগ দিতে পারত। রোমের লোকরা বলত :

"তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাও? তা বেশ তো, আমরা তোমাদের সঙ্গে রোমবাসীর মতই ব্যবহার করব। তার বদলে দরকার হ'লে তোমাকেও আমাদের মাতৃভূমির জন্যে প্রাণ দিতে হবে।"

বিজিত দেশের লোক এমন ভাল ব্যবহার আর কারুর কাছে পেতনা। তারাও হাসিমুখে রোমের পক্ষে চলে আসত।

রোম ছিল যেমন স্বাধীনতার আকর কার্থেজ ছিল ঠিক তার উল্টো। রোম চাইত সবাইর সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে। আর কার্থেজ চাইত সবাইকে দমন করতে। কাজেই কার্থেজের বড় লোকদের রোমের প্রতিপত্তিতে ভয়ানক ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

নানা কারণ দেখিয়ে তারা রোমের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিল। প্রথম যুদ্ধ হয় প্রায় পঁচিশ বছর ধরে। সে যুদ্ধে কার্থেজের নৌবাহিনী বিশেষ সুবিধা করে উঠ্‌তে পারেনি।

এরপরে আবার একটা তুচ্ছ কারণ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। খ্রীঃ পূঃ ২১৮ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু এবার রোমের ভাগ্য ছিল খারাপ। কার্থেজের সৈন্যদল বীর সেনাপতি হানিবলের অধীনে দমকা হাওয়ার মত সমস্ত রোমের সৈন্যদের হারিয়ে দিল। বরফে ঢাকা থাকায় যে আল্পস পর্ব্বত কেউ পার হ'তে সাহস করে না সেই পর্ব্বতের মধ্যে দিয়ে ভীষণ শীতের ভেতর হানিবলের বাহিনী ইটালীতে প্রবেশ করে। সে বাহিনীর গতিরোধ করা ছিল অসাধ্য। সমস্ত ইটালীই অচিরে হানিবলের পদানত হ'ল।

ইতালীর লোকরা তাবলে দেশপ্রেম ভোলেনি। তারা পরাজিত হ'লেও বিজেতাদের সঙ্গে আপোস করেনি। কাজেই সে দেশের লোকের সাহায্য না পাওয়ায় ইটালী শাসন করা হানিবলের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হ'য়ে উঠল। এদিকে স্পেনে দেখা দিল বিদ্রোহ। হানিবলের এক ভাই সেই বিদ্রোহ দমন করতে যান। কিন্তু বিদ্রোহীদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিদ্রোহীরা তার কাটা মাথা হানিবলকে উপহার দেয়। চারদিকের বিশৃঙ্খলা যখন খুব বেশী হ'য়ে উঠল তখন কার্থেজ থেকে হানিবলের ডাক এল। রোমকদের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে হানিবল এবার দাঁড়াতে পারলেন না। তিনি পরাজিত হ' দেশত্যাগ করে প্রাণ বাঁচালেন। একের পর এক দেশে পালিয়ে পালিয়ে যখন আর যুদ্ধে জেতার কোনই আশা রইল না তখন হানিবল বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

হানিবলের আল্পস্ অতিক্রম

ততদিনে রোমকরা কার্থেজ দমন করে সমস্ত শহর পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। তখন থেকে ইতিহাসে কার্থেজের নাম লোপ পেল।

এবার পৃথিবীর ইতিহাসে **রোমের অভ্যুত্থান** হ'ল।

আস্তে আস্তে কেমন করে যে বিরাট রোমক সাম্রাজ্য গড়ে উঠল তার খোঁজ কেউ রাখে না। রোমের মাটীতে বহু বড় বড় সেনাপতি জন্মগ্রহণ করেছে সত্যি কিন্তু কোনও সেনাপতি একা একা হঠাৎ এতবড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেনি।

হানিবলের পরাজয়ের পর থেকেই রোমের বিজয় অভিযান শুরু হয়। কার্থেজ থেকে পালিয়ে হানিবল মাসিডোনীয়া ও সিরিয়ায় যান। এই দুই

দেশের রাজা ফন্দী আঁটছিলেন মিশর জয় করবার। মিশরের সম্রাট ভয় পেয়ে রোমের শরণাপন্ন হন। রোম সেই সুযোগে মাসিডোনীয়া দখল করে সমগ্র গ্রীস দেশ জয় করে নেয়। রোম থেকে তখন একজন শাসনকর্তা এসে গ্রীস শাসন করত। সিরিয়ার রাজাও যখন হানিবলের প্ররোচনায় রোমের বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্র করছিলেন তখন সিপিও নামে একজন রোমক সেনাপতি সিরিয়া বিজয় করে নেন। এশিয়া মাইনরও গ্রীসের মতই রোমের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল।

দেশ বিদেশে যতই রোমের বিজয়ী সৈন্যরা শত্রু ধ্বংস করছিল রোমের মধ্যে কিন্তু ততই গরীবদের অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। সেনাপতিরা যুদ্ধের অজুহাতে নিজেদের হাতে সব ক্ষমতা একচেটিয়া করে নিচ্ছিল আর গরীবদের দুঃখের শেষ থাকছিলনা। আগে রোমে যেমন সকলে সমান সমান ছিল এখন আর তার লেশমাত্রও অবশিষ্ট রইল না। রোমের 'সাধারণতন্ত্র' নানা দেশ জয় করে হ'য়ে পড়ল বড়লোকদের 'প্লুটোক্র্যাসী'।

একশো থেকে দেড়শো বছরের মধ্যে রোমক সাম্রাজ্য গড়ে উঠল। এক একটা যুদ্ধে জেতার সঙ্গে সঙ্গে হাজারে হাজারে ক্রীতদাস আসত রোমে! এখনকার বড়লোকদের দেখবে কলকারখানা করে টাকা খাটাতে। কিন্তু তখনকার বড়লোকরা জানত ক্রীতদাস রাখতে। আর বিজিত দেশে জমীজমা কিনতে! বড় বড় জমিদারী কিনে শ'য়ে শ'য়ে ক্রীতদাস দিয়ে তারা সেই সব জমী চাষ করিয়ে নিত।

ক্রীতদাসদের ভাগ্যের চেয়ে দেশের প্লিবিয়ানদের ভাগ্য এমন কিছু ভাল ছিল না! এতদিন তারা বিনাবাক্যব্যয়ে রোমের পক্ষে লড়তে দেশ-বিদেশে গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ জয় করে যখন তারা সব দেশে ফিরে এল তখন কি দেখল? তাদের সোনার ক্ষেতে জমেছে আগাছা। তারা তবু দমবার পাত্র নয়। আবার নতুন উদ্যমে তারা জমী চাষ করল। নতুন ফোনা শস্য নিয়ে চাষীরা গেল বাজারে বিক্রী করতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাদের চক্ষুস্থির! হাজার হাজার ক্রীতদাস দিয়ে যে সব বড়লোকরা চাষবাস

করাতো তারা অনেক সস্তায় জিনিস বিক্রী করত। কোন লোক আর গরীবদের শাকশব্জীর দিকে নজর দিত না। তবু অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে তারা টিকে থাকার চেষ্টা করল। তাদের দুর্ভাগ্যের অন্ত ছিল না। শেষে খেতে না পেয়ে তারা গ্রামত্যাগী হ'ল। শহরে এসেও তাদের সৌভাগ্য দেখা দিল না। সকলে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবার উপক্রম হ'ল। দেশের জন্যে লড়েও যখন তাদের ভাগ্যে এত দুর্ভোগ দেখা দিল তখন তারা সবাই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। রোমের অভিজাত শ্রেণীর হাতে ছিল অনেক মাইনে করা সৈন্য ও পুলিশ। তাদের সাহায্যে সব রকমের বিদ্রোহ থামিয়ে রাখা হ'ত।

এমন সময় একজন সদাশয় ব্যক্তি রোমের গরীবদের জন্য অনেক সুবিধা আদায় করে দেন। তাঁর নাম হচ্ছে 'টাইবেরিয়াস গ্রাক্‌কাস' (Tiberius Gracchas)। তিনি নিয়ম করে দেন যে কেউ একা খুব বেশী জমী দখল করতে পারবে না। তাঁর এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিজাতশ্রেণীর সবাই এক হ'য়ে দাঁড়াল। তখন অভিজাতশ্রেণীর ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে বীর গ্রাক্‌কাসকে প্রাণ হারাতে হয়! তারপরে গেইয়াস্ গ্রাক্‌কাস নামে টাইবেরিয়াসের এক ভাই আরও সংস্কার করতে চান। কিন্তু অভিজাতশ্রেণী তাঁকেও খুন করেছিল।

কিছুদিন পরে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যেই বিরোধ দেখা দিল। তখনকার রোমে দুইজন খুব প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। একজন সল্লা (Sulla) আর একজন মারিয়ুস (Marius)।

সেই সময় কৃষ্ণসাগরের তীরে মিথ্রাইডেটিস (Mithridates) নামে একজন বীর নতুন এক সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন। তাঁকে দমন করবার জন্য রোম থেকে একদল সৈন্য পাঠান ঠিক হয়। কিন্তু কে সেই সৈন্যদলের সেনাপতি হবে তাই নিয়ে বাধল ভীষণ গণ্ডগোল। অবশেষে সল্লা-ই সেনাপতি হ'লেন। মারিয়ুস তখন গেলেন আফ্রিকায় পালিয়ে।

কিন্তু যখন তিনি খবর পেলেন যে সল্লা রোমের বাইরে চলে গেছেন তখন তিনি ফিরে এলেন রোমে এবং সেখানে একদল লোক নিয়ে বিদ্রোহ করে

রোম দখল করে নেন। জয়লাভ করে তিনি এতই আনন্দে মগ্ন হ'য়ে গেলেন যে মাত্র চারদিনের মধ্যেই মদ খেয়ে পিলে ফেটে মারা যান।

তারপর কিছুদিন রোম অরাজক হ'য়ে পড়ে। তখন সল্লা মিথ্রাইডেটিসকে হারিয়ে রোমে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি আগের বিদ্রোহীদের নির্ব্বিচারে হত্যা করতে শুরু করেন। একজন তরুণ একদিন হটাৎ ঘাতকদের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু বয়স কম বলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই তরুণের নাম জুলিয়াস সীজার। ইনিই পরে রোমের একছত্র অধিনায়ক হয়েছিলেন।

সমস্ত শত্রু দমন করে সল্লা নিজেকে রোমক সাম্রাজ্যের সর্ব্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করলেন। সর্ব্বাধিনায়ক হচ্ছেন কোনও দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বলতে যা বোঝায় তাই। পূর্ণ চারবৎসর এই ভাবে রাজত্ব করার পরে সল্লার মৃত্যু হয়।

সল্লার অভাবে আবার রোমে নানা অশান্তি আর উৎপাত দেখা দিল। তখন পম্পেই নামে একজন বিখ্যাত সেনাপতি সে সব অশান্তি দমন করতে লাগলেন। মিথ্রাইডেটিস আবার বিদ্রোহ করায় তিনি তাঁকে পরাজিত করেন। পরাজিত মিথ্রাইডেটিস আত্মগ্লানিতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। সেখান থেকে পম্পেই গেলেন সিরিয়াতে। জেরুজালেম শহর ধ্বংস করে তিনি পশ্চিম এশিয়াতে বিজয় অভিযানে যান। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের মত তিনিও কিছুকাল পরে দেশ বিদেশের নানা বন্দী রাজা ও অগণিত ধন সম্পত্তি লুন্ঠন করে এনে রোমকে উপহার দেন। চারদিকে পম্পেই (Pompey) এর জয়জয়কার পড়ে গেল।

পম্পেই এসে তিন জনকে নিয়ে একটি সমিতি (Triumvirate) গড়লেন। তাতে থাকলেন তিনি নিজে, ও স্পেনের তরুণ শাসনকর্ত্তা জুলিয়াস সীজার এবং ধনী ক্র্যাসাস। এদের তিনজনের মধ্যে জুলিয়াস সীজারই ছিলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ। তিনি চাইলেন আরও দেশ জয় করে নিজের গৌরব বাড়াতে।

তাই তিনি আল্পস্ পর্ব্বতের অন্যদিকে গল রাজ্য (এখন ফ্রান্স বলা হয়) জয় করতে যান। ফ্রান্স জয় করে তিনি রাইন নদীর তীর পর্য্যন্ত টিউটনদের

রাজ্যও পদানত করেন। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে গিয়েও তিনি রোমের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেন।

এমন সময় রোম থেকে খারাপ খবর আসায় তিনি ফিরে আসেন। পম্পেইর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সীজার তাঁকে রোম থেকে তাড়িয়ে দেন। পম্পেই গ্রীসে গেলে সীজার সেখানেও তাঁকে পরাজিত করেন। তখন পম্পেই মিশরে পালিয়ে যান। মিশরের রাজা টলেমির আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়। এদিকে সীজারও তখন মিশরে। কিন্তু পম্পেইর বিশ্বস্ত সেনাদল ও টলেমীর সৈন্যদের হাতে সীজারকে বেশ কিছু নাকাল হ'তে হয়েছিল। অবশেষে অনেক কষ্টে সীজার তাদের পরাজিত করে মিশর জয় করেন। টলেমীর বোন সুন্দরী ক্লিওপেট্রার হাতে রাজ্যভার দিয়ে সীজার রোমে ফিরে আসেন। মিথ্রাইডেটিসের ছেলে সেই সময় আবার বিদ্রোহ করায় মাত্র পাঁচ দিনের যুদ্ধে সীজার তাকে পরাজিত করে সিনেটের কাছে খবর পাঠান—'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' (Vini, Vidi, Vici)। সমস্ত রাজ্য জয় করে তিনি মিশরে ফিরে এসে ক্লিওপেট্রার সঙ্গে অনেক দিন আমোদ প্রমোদে কাটান।

তারপর সীজার সিনেটের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে নিজের দিগ্বিজয়ের খবর জানান। এত বড় সেনাপতিকে কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে সিনেট তাঁকে দশ বছরের জন্য সর্ব্বাধিনায়ক করে দিল। এটাই হ'ল তাদের প্রধান ভুল।

সীজার দেশের নানা সংস্কার সাধন করেছিলেন। প্লিবিয়ানদেরও তিনি সিনেটে ঢোকবার অধিকার দেন। প্রাচীন যুগের মত তিনিও বিদেশী লোকজনকে রোমের নাগরিক হবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এমন কি এই সব বিদেশীরা শাসন-কার্য্যেও হাত দিতে পারত। তিনি আরও নানা জনহিতকর কাজ করেছিলেন।

কিন্তু তাতে বিরক্ত হ'য়ে একদল বড়লোক সীজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। অবশেষে ১৫ই মার্চ্চ তারিখে সিনেটে ঢোকবার সময় তাঁকে খুন করা হয়।

সীজারের মৃত্যুর পর রোমের নেতৃত্ব নিয়ে সীজারের কর্ম্মসচিব এ্যণ্টনী ও অক্‌টাভিয়াসের ভিতর ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলে। অক্‌টাভিয়াস রইলেন

রোমে আর এ্যাণ্টনী গেলেন মিশরে। সেখানে তিনি ক্লিওপেট্রার ছলনায় ভুলে যান। এমন সময় অক্টাভিয়াসের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তিনি পরাজিত হ'য়ে আত্মহত্যা করেন। তখন ক্লিওপেট্রা ও অক্টাভিয়াসের হাতে বন্দী বধ হবার ভয়ে বিষখেয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

অক্টাভিয়াস ছিলেন খুব বুদ্ধিমান ও সাবধানী। তিনি জানতেন যে অনেকে কেবল কথার মানে না বুঝেই হৈ চৈ করে। তাই তাঁর মনে যতই দুরাশা থাক না কেন তিনি দেশে ফিরে সাধারণ লোকের ভয়ে কোনও বিশেষ উপাধির দাবী করেন নি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সিনেটের উপর তিনি এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করেন যে কিছুদিন পরে তারা অক্টাভিয়াসকে "অগাষ্টাস" বা "মহামহিমময়" উপাধি দেন। তখন তিনি কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি। তারপর সাধারণ লোকে পথে ঘাটে তাঁকে ডাকত 'কাইজার' বলে। সৈন্যরা অক্টাভিয়াসকে তাদের সেনাপতি বলেই মনে করত। তাই তাদের কাছে তিনি ছিলেন 'ইম্পারেটর', বা সম্রাট! এই ভাবে খুব ধীরে ধীরে জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে অক্টাভিয়াস রোমক সাধারণতন্ত্রের কাঠামো বদলে সেখানে নিজেকে সম্রাট বলে জাহির করলেন।

অক্টাভিয়াসের পর থেকে সমস্ত সম্রাটই 'সীজার' উপাধি নিতেন। প্রকৃত পক্ষে 'সীজার' কথাটির মানে ছিল 'সম্রাট।' পরের যুগে জার্ম্মান সম্রাটের উপাধি 'কাইজার' ও রুশের 'জার' (Kaiser & Tsar) সবই এই সীজার শব্দ থেকে এসেছে। কাইজার শব্দটি হিন্দুস্থানীতেও প্রচলিত। ভারতে বলা হয় 'কাইজার-ই হিণ্ড'—মানে ভারতের সম্রাট!

লোকে ক্রমে তাঁকে ভগবানের অংশ বলে মনে করত। তখন থেকে তাঁর বংশের লোকই সম্রাট হ'ত।

অক্টাভিয়াসের পরে থেকেই রোমের গৌরব কমে আসতে থাকে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে টিউটনরা ক্রমশঃই বেশী শক্তিশালী হ'য়ে তাদের দেশ দখল করে নিচ্ছিল। নিজেদের দেশের মধ্যে চিরকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ করায় স্বাধীন চাষীর দল ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল। দাসপ্রথায় সব কাজ হওয়ায় কোনও স্বাধীন লোকই

আর সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। শহরের পথে ঘাটে তখন ঘুরে বেড়াত শ'য়ে শ'য়ে গরীব ভিক্ষুকের দল! সেই সঙ্গে অপদার্থ রাজকর্মচারীর দল ঘুষ খেয়ে খেয়ে জনসাধারণের উপর কত যে অত্যাচার করত তার তুলনা নেই। বাইরে থেকে তখনো রোমক সাম্রাজ্যের বিরাট কাঠামো দেখা গেলেও ভেতরে তাতে ঘুণ ধরেছিল! যে দাস প্রথার জোরে রোম এতবড় হয়েছিল—আর সামলাতে না পারায় সেই দাস প্রথাই রোম সাম্রাজ্য ভেঙে দেয়! যীশুর জন্মের প্রায় ৭৩ বছর আগে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে এক বিরাট দাস বিদ্রোহ ঘটেছিল রোমে। এবং সবসময়ই ক্রীতদাসরা মাথা তুলতে চাচ্ছিল।

রোমের প্রতিষ্ঠার পরে তখন মাত্র সাতশো তিপ্পান্ন বছর হয়েছে। গেইস জুলিয়াস সীজার অক্টাভিয়াস অগাষ্টাস তখন রোমের সম্রাট!

দূরে, বহু দূরে সিরিয়া প্রদেশের একপ্রান্তে ছোট একটি গ্রামের ছুতোর যোসেফের স্ত্রী মেরীর গর্ভে এক শিশু জন্মেছে বেথেলহামের আস্তাবলে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!

অচির ভবিষ্যতে এই আস্তাবল আর রাজপ্রাসাদের ভেতর শুরু হয় ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং আরও আশ্চর্য্যের কথা যে সেই যুদ্ধে আস্তাবলই হ'য়েছিল বিজয়ী!

এবার শুরু হ'ল **যীশুখ্রীষ্টের** যুগ।

নাজারেথে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়। গালিলি প্রদেশে তিনি ধর্মপ্রচার করতেন ও অবশেষে প্রায় ৩০ বছর বয়সে জেরুজালেমে আসেন। জেরুজালেমে আসবার অল্পকালের মধ্যেই যীশুকে রোমক-শাসনকর্তা পন্টিউস পাইলেট বন্দীকরে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেন।

যীশুর জীবনের গল্প সামান্যই আমরা জানি। অনেকে মনে করেন যে মধ্য এশিয়া, কাশ্মীর, লাডাক ও তিব্বত অঞ্চলে যীশুখ্রীষ্ট ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন। অনেকে বলেন যে যীশু ভারতবর্ষেও এসে-ছিলেন। তবে এ সমস্ত ধারণার মূলে কতটা সত্যি আছে বলা কঠিন। এসব

বাস্তব হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের নয়। কারণ তখনকার দিনে ভারতের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলায় পশ্চিম অঞ্চলের বহু ছাত্র আসত। এবং সত্যি সত্যি যীশু ও গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মমতের মধ্যে এত সাদৃশ্য আছে যে মনে হয় যীশুখ্রীষ্ট সে বিষয়ে অনেক কিছু জানতেন।

খ্রীষ্টধর্ম্ম যতই লোকের মধ্যে বেশী প্রচারিত হয় তত তারা যীশুকে ভগবানের অবতার বলে মনে করতে থাকে। যীশুও অবশ্য অনেক সময় নিজেকে ভগবানের সন্তান বলে ভাবতেন। তাতেই শিষ্যদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়।

শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে ইংল্যাণ্ড বা পশ্চিম ইউরোপে প্রচারের বহু আগে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর একশ' বছরের মধ্যেই সমুদ্র-পথে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা দাক্ষিণাত্যে এসে ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন।

তোমরা সবাই হয়তো পড়েছো যে ধর্ম্ম নিয়ে সবসময় পৃথিবীতে আগে ভীষণ মারামারি হ'ত। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখবে যে, সব ধর্ম্মের মধ্যে অনেক জিনিস আছে একরকম। তবে হয় কি জানো? প্রথম ধর্ম্মপ্রচারকরা যে সব শিক্ষা দেন পরের লোকরা আর তা জানতে পারে না। যতই দিন যায় ততই ধর্ম্মেরই রূপ বদলাতে থাকে। আগেই পড়ে থাকবে যে ধর্ম্মকে অনেক সময়ই রাজা-রাজরারা রাজনীতির কাজে লাগাতে দ্বিধা বোধ করে নি। রোমের রাজাদের নিয়মই ছিল—ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে জনসাধারণকে কুসংস্কারের ভেতর ডুবিয়ে রাখা। কারণ, তাহলে তাদের শাসন করা অনেক সহজ হয়। এর অনেক পরে ইতালীর একজন নামকরা রাজনীতিজ্ঞ মেটারনিক্ তাঁর বই "প্রিন্স" (রাজকুমার) লিখেছেন যে রাজ্য চালাতে গেলে কোন না কোন ধর্ম্ম মানা উচিত। সেই ধর্ম্মে যে রাজার বিশ্বাস রাখতে হবে এমন কোনও কথা নেই। মিথ্যে হ'লেও সেই ধর্ম্মের আবরণ না থাকলে প্রজাশাসন করা কঠিন

যীশুর জন্ম হয় ইহুদী বংশে। ইহুদীরা প্রথম প্রথম যীশুকে শ্রদ্ধা করত, কিন্তু যীশু যখন ধনীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, তখন থেকেই ইহুদীরা সব আশা ছেড়ে দেয়। ক্রুশবিদ্ধ করার সময় যীশুর বয়স ছিল মাত্র তিরিশ বছর। প্যালেষ্টাইনের বাইরের লোকরাও কেউ তাঁকে বড়

একটা চিনত না। তাঁর মৃত্যুর পর একজন শিষ্য 'পল' খ্রীষ্টানধর্ম্ম নানাদিকে প্রচার করতে থাকেন। প্রথম প্রথম রোমকরা এ বিষয়ে তত নজর দিত না। কিন্তু ক্রমেই ধনিকরা পরধর্ম্ম অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল। রোমকরা তখন ওদের পাগল ভাবত। রোমের দাসশ্রেণী খ্রীষ্টধর্ম্মের ভেতর শান্তি পাওয়ায় তাদের মধ্যে এ ধর্ম্ম দ্রুত প্রচারিত হ'তে থাকে।

এই সময় দিয়ে ও তার আগে থেকেই রোমক সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ঘুণ ধরেছিল। খুব ধীরে ধীরে **রোমের অধঃপতন** হচ্ছিল। জনসাধারণ তখন সব সময়েই থাকত অসন্তুষ্ট—আজ দুর্ভিক্ষ, খাবার জিনিষ মেলে না কিংবা যা-ও মেলে তারও এত দাম যে গরীবরা কিনতে পারে না! কাল হয়তো শাসন-কর্ত্তাদের অত্যাচারে ভিটেমাটী উচ্ছন্ন হয়ে যাবে। বড়লোকরা তখনো থিয়েটারে গিয়ে আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকত, আর গরীবরা বস্তীতে, পল্লীতে না খেতে পেয়ে মারা যেত।

তখনো বাইরে থেকে দেখ্‌লে কেউ বলতে পারত না যে রোমের পতন হবে। নানা দেশ বিদেশের মধ্যে বড় বড় পাকা রাস্তা, পুলিশের ভয়ে রাস্তায় চোর ডাকাতের দেখা মিলত না। বিদেশী শত্রুরা যাতে দেশ আক্রমণ করতে না পারে তার জন্যে প্রত্যেক সীমান্তে কড়া পাহারা। আর কত দেশ যে রোমের অধীন হ'ল তার ইয়ত্তা নেই। ইওরোপের লোকদের ধারণা যে তখন সমস্ত পৃথিবীটাই ছিল রোমের অধীন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। চীনের 'হান' রাজবংশ তখন সমস্ত এশিয়া ও ইউরোপের কাস্পিয়ান হ্রদ অবধি ভূভাগে রাজত্ব করেছিল। ভারতের কুশান রাজবংশও তখন বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী।

রোমের গঠনতন্ত্র মূলতঃ ঠিক আগের গ্রীসের ছোট ছোট রাষ্ট্রের মত ছিল। সমস্ত পৃথিবী জয় করার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে গিয়ে দেশের অগণিত বীরপুরুষ প্রাণ হারায়। যুদ্ধের বোঝা বইতে বইতে চাষী ও কৃষকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তারপর তাদেরও তো যুদ্ধে যেতে হ'ত কিনা, তাই বছরের পর বছর হয়তো ক্ষেতে ফসলই ফলল না। তারা একের পর এক ভিক্ষা করে খেতে

লাগল। তখন বাধ্য হ'য়ে অনেকে বড় বড় জমিদারের কাছে গিয়ে খাওয়া পরার বদলে কাজ করতে রাজী হ'ল। এই বেগার খাটার দল থেকে পরের যুগের সার্ফ (Serf) বা ভূমিদাস প্রথার জন্ম। এরা না স্বাধীন, না ক্রীতদাস।

দেশের ক্রীতদাসরা সেই সময় পলের কাছ থেকে যীশুর ধর্ম্মকথা শুনল। দেখতে দেখতে তারা নাজারেথের সেই আস্তাবলের শিশু যীশুর খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা নিল। দীক্ষা নিয়ে তারা কেউ বিদ্রোহ করল না—কারণ, যীশু বলেছিলেন যে সবাইকে বিনয়ী হ'তে হবে—কেউ কাউকে হিংসা করতে পারবে না। তারা তখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সাম্রাজ্যের সুবিধার জন্য যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করল।

দেখতে দেখতে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল। প্রথমের রোমক সম্রাটরা ছিলেন সত্যিকারের নেতা। আর পরের যুগে তাঁরা হ'লেন পেশাদারী সৈন্যাধ্যক্ষ। জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রইল না দেহরক্ষীদের জোরে তাদের রাজত্ব টিকে রইল। দেশের সেই দুর্দ্দিনে একের পর এক সম্রাট খুন আর বিদ্রোহ করে রোমের সিংহাসন দখল করত।

অসভ্যরা রোম জয় করল

এদিকে উত্তরাঞ্চলের অসভ্যরা রোমের সীমান্তে ক্রমাগত হানা দিতে লাগল। রোমের অন্তর্যুদ্ধের ফলে সেনারাও তেমন উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করত

না। ফলে রোমকরা প্রত্যেক যুদ্ধে হেরে গেল। দেশের ভেতরেও বিদ্রোহ শুরু করেছিল।

তখন সম্রাটরা দেখলেন যে দেশের বিদ্রোহ আর বিদেশী আক্রমণের জন্য রোমে রাজধানী রাখা নিরাপদ নয়। সম্রাট কন্সটান্‌টাইন তখন রাজধানী সরিয়ে এশিয়া মাইনরের মুখে বাইজানটিউমে নিয়ে আসেন।

সেই শহরের নতুন নামকরা হ'ল কন্সটান্‌টিনোপল, সম্রাট কন্সটান্‌টাইনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলের একজন রোমে রাজধানী করলেন ও আর একজন কন্সটান্‌টিনোপলে থেকে রাজত্ব পরিচালনা করতেন।

কিন্তু রোমের অধীনে যে যে সাম্রাজ্য ছিল বিদেশী আক্রমণে তা বেশীদিন টেকেনি। বর্ত্তমানের জার্মানীর লোকদের তখন 'গথ' (Goth) বলা হত। তারা পর পর বহুবার রোম আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দেয়; আমাদের ভারতবর্ষেও যেমন হিন্দুযুগের শেষে একের পর এক বিদেশী শত্রু ভারত আক্রমণ করেছিল, রোমেও তাই হ'ল। গথের পরে ভ্যাণ্ডাল, (Vandal) ও তারপর হুন। এদের আক্রমণে পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যায়।

পূর্ব্ব সাম্রাজ্য সব রকম বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। মজার কথা হচ্ছে এই যে পূর্ব্ব সাম্রাজ্য স্থাপন করবার সময় সম্রাট কন্সটান্‌টাইন নিজে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ক্রমে রোমের পূর্ব্ব সাম্রাজ্য পশ্চিম সম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ে। রাজ্যের ভাষাও লাটিন থেকে গ্রীকে বদলে নেওয়া হয়। এক কথায় পূর্ব্ব সাম্রাজ্য কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রীক হ'য়ে পড়ে। লোক তখন মনে করত যে পূর্ব্ব রোমক সাম্রাজ্য ছিল আগের যুগের আলেকজান্দারেরই রাজত্বের নতুন সংস্করণ। এ সাম্রাজ্যের নাম হ'ল 'বাইজান্‌টাইন' সাম্রাজ্য।

প্রায় ১১০০ এগার শ বছর রাজত্বের পর অটোমান তুর্করা ১৪৫৩ খৃঃ কন্সটান্‌টিনোপল দখল করে তুর্কীর পশ্চিমে প্রাধান্য স্থাপন করে। তুর্কীরা কন্সটান্‌টিনোপলের নাম বদলে 'ইস্তানবুল' (Istanbul) রাখে। ক্রমে তুর্কীরা ইওরোপের প্রধান অংশও আয়ত্ত করে। প্রায় ৫০০ বছর একছত্র রাজত্ব

চালাবার পর তারাও ক্রমে নিস্তেজ হ'য়ে আসে এবং বিগত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে পরাজিত হ'য়ে তারা সব সাম্রাজ্য হারায়। এর পরে বীর কামাল পাশা আবার তুরস্ককে স্বাধীন করে গড়ে তোলেন। যত কিছু কুসংস্কার, তিনি দূর করে দিয়েছেন। এমন কি সেখানে সোভিয়েটের আদর্শে আরবী ভাষার অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের এ, বি, সি ডি, দিয়ে আরবী ভাষা লেখা হয়। ১৯৩৯ সালে কামাল পাশার মৃত্যু হয়েছে।

পশ্চিম সাম্রাজ্য হারিয়ে গেলেও কিন্তু কেমন করে যেন রোমের নামের গৌরব মোটেই কমেনি। লোকে রোমের নামে গর্ব্ব অনুভব করত। যীশুর একজন প্রধান শিষ্য পিটার রোমে এসে প্রথম বিশপ হন। সেই থেকে খ্রীষ্টানদের কাছে রোমের পাদ্রীর আদর আরো বেড়ে যায়। পরে এঁকেই পোপ বলা হ'ত এবং ইনিই সমস্ত খৃষ্টান জগতের কর্তা হন। সেই সময় রোম ও কন্সটান্‌টিনোপলের খ্রীষ্টানদের মধ্যে উপাসনার পদ্ধতি নিয়ে মনোমালিন্য হয়। রোমের খ্রীষ্টানরা মূর্ত্তি উপসনা করত।

এর পরে উত্তরাঞ্চলের 'গথ'রা বহু যুগ ধরে রোমে রাজত্ব করে। তারা তখনও কন্সটান্‌টিনোপল এর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করত। ক্রমে ক্রমে রোমের পোপের ক্ষমতা বাড়তে থাকে ও অবশেষে তিনি কন্সটান্‌টিনোপলের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করেন।

ইতিমধ্যে ইস্‌লামের ক্ষমতা এত ভীষণ ভাবে বেড়ে গিয়েছিল যে তাদের দাপটে সারা ইওরোপ কম্পমান। তারা রোম সাম্রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হ'লে পোপ জার্মানীর রাজা কার্থ-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরে তিনিই রোমের সম্রাট হ'য়ে বসেন। কিন্তু তাঁর প্রধান রাজত্ব ছিল জার্মানীতে। জার্মানীর রাজা হ'লেন রোমক সম্রাট—কিন্তু সাম্রাজ্যের নাম হ'ল 'পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য' (Holy Roman Empire)। খ্রীষ্টান সাম্রাজ্য বলেই এর নাম হ'ল "পবিত্র"!

তাহলে দেখ নামের মহিমা কেমন! রোমের পূর্ব্ব গরিমা কিছুই ছিল না কিন্তু তবু লোকে রোমের নামের সঙ্গে যোগ না রেখে পারত না। ক্রমে এমন অবস্থা হ'য়ে দাঁড়াল যে রোমক সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যও রইল না। তবু

তার নাম ছিল সেই "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য!" সেই জন্যে পরের যুগে ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক ভলটেয়ার ঠাট্টা করেছিলেন যে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য না পবিত্র, না রোমক, না সাম্রাজ্য—কোনটাই নয়।

এমনি ভাবে প্রায় হাজার বছর ধরে রোমক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় ছিল। তারপর প্রায় ১০০ বছর আগে নেপোলিয়ন শেষবারের মত রোমকসাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেন।

রোমক সাম্রাজ্যের শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের এক গৌরবময় অধ্যায়ের শেষ হ'য়ে যায়! চোখের পলকে যেন কি ঘটে গেল—মানুষ যেন পিছিয়ে গেল যুগ যুগান্তের অন্ধকারে। ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, গ্রীস সব দেশেই ও রকম অন্ধকার যুগ দেখা দিয়েছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি—সব কিছুর উৎস বন্ধ হ'য়ে গেল।

বিদেশী শাসকদের অত্যাচারে ইটালীর জনসাধারণ তিক্তবিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে প্রেরণা এনে দেন তরুণ দেশপ্রেমিক ম্যাৎসিনি। 'নবীন ইটালী' সঙ্ঘ গড়ে তিনি সমস্ত ইটালী জুড়ে বিদ্রোহ প্রচার করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন গ্যারিবল্ডী। ম্যাৎসিনি ছিলেন দার্শনিক, গ্যারিবল্ডী সৈনিক। এবার তাঁরা আর একজনের সাহায্য পেলেন। তিনি হলেন 'কাভুর'। এই তিনজন দেশপ্রেমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইতালী স্বাধীনতা ফিরে পায়।

ইটালী স্বাধীন হ'ল বটে, কিন্তু ম্যাৎসিনির আদর্শ সফল হ'ল না। দেশে সকলের সুখের জন্যে তিনি গণতন্ত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল রাজার রাজত্ব। গরীবদের সুবিধা হ'ল না তেমন।

এমনি ভাবে রাজার অধীনে ইটালী ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত কোনও রকমে টিকে ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই ইটালীতে ফ্যাসিজমের বীজ প্রবেশ করে। **মুসোলিনী** ছিলেন প্রথমে সমাজতন্ত্রবাদী। শ্রমিকদের কিসে ভাল হয় তাই দেখা হ'ল সমাজতন্ত্রবাদীদের কাজ। কিন্তু মুসোলিনী সমাজতন্ত্রবাদী বলে জাহির করলেও সত্যিকারের মজুরদের ভাল চাইতেন না। তাঁর সঙ্গে আগে যারা কাজ

করতেন তাঁরা মুসোলিনীর সব মতামত পছন্দ না করায় মুসোলিনী নিজেই এক দল গড়ে তোলেন। তাদেরই বলা হয় ফ্যাসিস্ট। যুদ্ধের পর যুদ্ধ-ফেরৎ সিপাহীদের এল মহা দুর্দ্দিন। যুদ্ধে তারা অকুণ্ঠচিত্তে প্রাণ দিল কিন্তু যারা আহত হ'ল বা ভাল ভাবে ফিরে এল তাদের খাবার পড়বার বিশেষ বন্দোবস্ত ইটালীর রাজা করতে পারলেন না। এদের নিয়েই মুসোলিনী দল গড়েন। মারামারি কাটাকাটি ছিল এদের মূলমন্ত্র। মজুরদের সঙ্গে এরা করত খুব খারাপ ব্যবহার। যেখানেই মজুররা নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য ধর্ম্মঘট করতে চাইত সেখানেই এরা গোলমাল আর গুণ্ডামী করে ধর্ম্মঘট ভেঙে দিত। ইটালীতে তখন কমিউনিজমও ছড়িয়ে পড়েছিল। ফ্যাসিজম হ'ল কমিউনিজমের চিরশত্রু। কমিউনিজম চায় চাষীমজুরের রাজত্ব। সব দেশের বেশীর ভাগ লোকই হ'ল চাষীমজুর। কাজেই কমিউনিজমে তাদের ভাল ছাড়া খারাপ হবার কিছু নেই। কিন্তু ফ্যাসিজম চায় চাষী মজুরদের ভুলিয়ে শোষণ করতে। কমিউ-নিজমের বিপক্ষে বলে দেশের বড়লোকরা মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট দলকে খুব সাহায্য করতে থাকে।

মুসোলিনী এককালে সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন। তিনি যখন গরীবদের মধ্যে কথা বলতেন তখন দিতেন বড়লোকদের গালাগালি। চাষী মজুর ভুল করে মুসোলিনীকে তখন হিতৈষী মনে করত।

মধ্যবিত্ত সমাজের লোকও যুদ্ধের পরে সবচেয়ে খুব বেশী অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের মুসোলিনী ক্ষেপিয়ে দেন।

মুসোলিনীর দলে যখন লোক বাড়ছিল তখন সমাজতন্ত্রবাদীদের দল কিন্তু এক হ'য়ে তাঁকে বাধা দেয়নি। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। সে সুযোগে বড়লোকদের সাহায্যে মুসোলিনী ইটালীর সর্ব্বাধিনায়ক (Dictator) হ'য়ে পড়েন।

সমস্ত দেশেই রাজা বদলালে নতুন সরকার নানারকম কাজকর্ম্মের ফিরিস্তী শোনায় জনসাধারণকে। কিন্তু মুসোলিনী তো আর জনসাধারণের ভাল চান না। তিনি শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েই বললেন:

"আমাদের কাজের ধারা খুব সহজ, আমরা ইটালী শাসন করব।"

ফ্যাসিজমের মধ্যে কোনও আদর্শ বা নীতির বালাই নেই। অতীতের রাজার যুগের রোমে কি হ'ত তারই গৌরব করে ইটালী শাসন করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তোমার কাছে যদি কেউ অতীতের ভারতের গৌরবের কথা বলে তাহলে তোমারও ভাল লাগবে, তেমনি ইটালীর লোকরাও মুসোলিনীর মুখে অতীতের প্রশংসা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ত। মুসোলিনী তো তাই চান। ফ্যাসিস্টদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে নির্ব্বিবাদে মুসোলিনীর কথা মেনে চলতে হবে। কারুর মনে বিচারশক্তি থাকতে পারবে না। মুসোলিনীর উপাধি হ'ল 'ইল্ ডুচে'—মানে 'নেতা'!

মুসোলিনীর মুখ কাঁচু মাচু

ক্ষমতা হাতে পেয়েই মুসোলিনী ছলে বলে কৌশলে অন্য সব শত্রুদের হত্যা করেন। 'মাত্তিওত্তি' নামে একজন সমাজতন্ত্রীকে নির্মম ভাবে খুন করা হয়! 'আমেনডোলা' বলে আর একজনকেও মারতে মারতে মেরে ফেলা হয়। আরও যে কতজনকে মারধোর করা হয় তার ইয়ত্তা নেই।

ফ্যাসিজমের আর একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মেয়েদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া। কোন ফ্যাসিস্ট দেশেই মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। তাদের পাঠানো হয় রান্না ঘরে। ঘর গৃহস্থালীর কাযই যেন তাদের একমাত্র কাজ।

ফ্যাসিজমের আমলে ইটালীর গরীবদের দুঃখের অন্ত ছিল না। মুখে যতই বড়লোকদের গালাগালি দিক না কেন, কাজে কিন্তু বড়লোকদের স্বার্থ বজায় রাখাই ফ্যাসিস্টদের লক্ষ্য। ইটালী ছাড়াও অন্যদেশে অন্য নামে ফ্যাসিজমের প্রসার হয়েছে। যখনই কোন দেশের চাষী মজুররা এক হ'য়ে শোষণের হাত থেকে মুক্তির দাবী জানায় তখনই বড়লোকরা সে আন্দোলন দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে ফ্যাসিজমের আশ্রয় নিয়ে।

প্রথমে চেষ্টা হয় মুখে বড়লোকদের গালিগালাজ দিয়ে চাষী মজুরদের ভুলিয়ে নিজেদের দলে ভিড়ানো। গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকরা বেকার বসে থাকলে তাদের লোভ দেখিয়ে দলে টানা হয়। এভাবে সকলকে নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। তার টাকা জোগায় বড় লোকরা। সে আন্দোলনের বুলি হয় চাষী মজুরদের একতা ভেঙে দেওয়া। এতে ধনীদের স্বার্থ বজায় থাকে বলে সব ধনিক দেশেই এরকম দল বাড়তে থাকে। পরে সুবিধা পেয়ে এরা দেশের রাজত্ব কেড়ে নেয়। এইভাবে জার্ম্মাণীতে হিটলার নাৎসী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই ফ্যাসিস্টরা দেশজুড়ে যুদ্ধের আয়োজন চালায়। যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ করলে দেশের সবাইকে কাজ দেওয়া সহজ। কতলোক কতদিকে দরকার হয়। সৈন্য দরকার হয় কত। কেরাণীও তেমনি। রাস্তাঘাট যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, কামান গোলা-বারুদ এসব বানাতেও অনেক লোক লাগে। কাজেই ফ্যাসিস্টরা রাজত্ব পেয়েই যুদ্ধ যুদ্ধ বলে চীৎকার করে। যুদ্ধে যে কত লোক প্রাণ হারায়, দেশের যে কত ক্ষতি হয় সে সব তারা ভুলে যায়। কেননা মরার সময় তো মরবে গরীবরা কি না!

ইটালীতে, মুসোলিনী হর্ত্তাকর্ত্তা হ'য়েই আবাল বৃদ্ধ সবাইকে বললেন রণসাজে সাজতে। তাঁর প্রথম শিকার হ'ল আবিসীনীয়া। আফ্রিকার উত্তরে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘেরা প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদশালী একটি দেশের নাম আবিসীনীয়া। এদেশের রাজার ধর্ম্ম খ্রীষ্টান। ১৮৯৬ খৃঃ ইতালী একবার

এই দেশ জয় করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছিল। তারই প্রতিশোধ তুললেন মুসোলিনী সেই দেশ জয় করে।

ইওরোপের ছোট্ট রাজ্য আলবেনিয়াও বাদ গেল না। মুসোলিনী বড়র দিকে না ভিড়ে ছোটদের গ্রাস করেন আগে। জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখেন।

পৃথিবীর চাষী-মজুরদের রাজত্ব সোভিয়েট রাশিয়ার উপরেই তাঁদের আক্রোশ হল বেশী। স্পেনের লোকের মাথার উপর জোর করে তাঁরা ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোকে চাপিয়ে দেন। এমনি করে ধীরে ধীরে তাঁরা পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু করেন।

তবে যুদ্ধের ফল মোটেই ফ্যাসিস্টদের পক্ষে সুবিধা হয়নি ইটালী থেকে মুসোলিনীকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে। তাঁর ফ্যাসিস্ট পার্টি ছত্রভঙ্গ।

এখন ইতালীতে আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে। দেশের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র কমিউনিস্ট নেতা এর্কলির অক্লান্ত পরিশ্রমে সব রকমের দলের মধ্যে একতা এনে নতুন ইতালী গড়ে তোলবার আয়োজন হয়েছে।

'ঘুমন্ত ভালুক' চীন

ভারতেরই প্রতিবেশী চীনের ইতিহাস শুনবে না? চীনদেশের ইতিহাসে কিন্তু আমাদের মত আর্য্যজাতির নাম শুনতে পাবে না। সেদেশে থাকে মঙ্গোল জাতি।

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়ায় এক যাযাবর জাতি চীন আক্রমণ করেছিল। আক্রমণকারীরা জংলী জীবন ছেড়ে বর্ব্বর সমাজে পা বাড়িয়েছিল মাত্র। তারা চাষবাস করত। আর তারই সঙ্গে পশু পালনও করত। চীনের ম্যাপ খুললে দেখবে 'হোয়াং-হো' বা পীত নদী এঁকে বেঁকে চীনসাগরে গিয়ে মিশেছে। তারই পাশের উর্ব্বর শস্যশ্যামল অঞ্চলে থাকত এরা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমস্ত চীনের বুকে ছড়িয়ে পড়ে মঙ্গোল জাতি।

তাদের ভেতর পিতৃশাসন বেশ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমস্ত কুলের লোক ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচন করত। এমনি একজন নেতার নাম হচ্ছে 'ইয়াও'। প্রায় ৪০০০ বছর আগে ইনি সমগ্র চীনের 'সম্রাট' বলে জাহির করেন নিজেকে। সম্রাট বললেও কিন্তু মনে করো না তিনি ছিলেন আমাদের যুগের সম্রাটের মত স্বেচ্ছাচারী। নামে সম্রাট হ'লেও কাজে ছিলেন তিনি শুধু নেতা-ই।

ইয়াও-এর মৃত্যু হ'লে তাঁর ছেলে হয়নি সম্রাট। সমস্ত কুল থেকে বাছাই করে যিনি যোগ্য বলে বিবেচিত হ'লেন তিনিই হ'লেন পরের 'সম্রাট'!

যতই দিন কাটল ততই নেতার পদ চীনেও বংশানুক্রমিক হ'য়ে দাঁড়াল। তখন প্রায় চারশো বছর ধরে 'শিয়াও' বংশ চীনে রাজত্ব করে। এঁদের শেষ সম্রাট ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তাঁর অধীনে না থেকে দেশের লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার পরে প্রায় ৬৫০ বছর শাং বা 'ইন' বংশ ছিল চীনের শাসন কর্তা!

দুচার লাইনের মধ্যেই আমরা চীনের হাজার বছরের ইতিহাস পড়ে ফেললাম! একটু কেমন কেমন ঠেকছে, না? সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেক পাঁচজনের মধ্যে একজন হচ্ছে চীনা। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত দেশ হচ্ছে চীন। কত যুগ যুগান্তের ইতিহাস আছে সেখানে জমে আর কিনা আমরা ছুঁতে ছুঁতেই হাজার বছরের কাহিনী শেষ করে দিলাম! হাজার বছরের ধারণা করাও তো কঠিন! তবে ঘাবড়ে যেও না। এখন থেকে আমাদের দেশের হাজার বছরের ইতিহাস তোমরা অনেকেই পড়েছো। কত জাতি এসেছে কত ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যে তার কোনও শেষ আছে? তাহলেই ভেবে দেখো যে চীনের সেই হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের পেছনে কত ঘটনা রয়েছে।

'জনযুগে'র শেষ হ'ল ধীরে ধীরে। গরীব আর বড়লোকের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে চীনেও প্রতিষ্ঠিত হ'ল শাসক বর্গ! সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থা দেখা দিল সেদেশে।

সেই প্রাচীন যুগেই চীনে 'লেখা'র ব্যবহার ছিল। তবে আমাদের মত অক্ষরের ভাষা নয় সেটি। ছবি নিয়েই হ'চ্ছে চীনের অক্ষর।

শাং বংশের পতন হয় জনসাধারণের বিদ্রোহে। তখন চৌ বংশ প্রায় ৮০০ বছর ধরে আবার রাজত্ব করেছিল। শাং বংশের পতনের সময় 'কি-শি' নামে একজন রাজার বন্ধু চৌ রাজবংশের অধীনে না থেকে দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন পূর্ব্বদিকে। তাঁর সঙ্গে চলল আরো হাজার পাঁচেক লোক। অবশেষে তাঁরা উপস্থিত হ'লেন এক অজানা দেশে। এদেশের নাম দিলেন তিনি "প্রত্যূষের নিঝুম রাজ্য" (Land of the Morning Calm)। এরই আধুনিক নাম হ'ল 'কোরিয়া'। 'নিঝুমপুরী' কোরিয়া আজ পররাজ্য-লোভী জাপানের পদানত!

চৌ বংশের রাজত্বকালে চীনের শাসন ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়। সে সময়েই চীনের মহামনীষী 'কনফুসিয়স' জন্মেছিলেন।

কনফুসিয়াসের জীবনচরিত খুবই সহজ। খ্রীষ্টের জন্মের ৫৪০ বছর আগে তাঁর জন্ম। চারদিকের লুঠতরাজ ঝগড়াঝাটির মধ্যেও তিনি এককোণে সাধনা করে যেতেন। হিংসায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। এঁর একমাত্র কামনা ছিল কি করে চীন দেশের উপকার করতে পারেন। মনে প্রাণে যেন সবাই ভাল হ'তে পারে সে শিক্ষাই তিনি দিয়েছিলেন সারা জীবন ধরে।

দয়ার অবতার ছিলেন কনফুসিয়াস। অন্য সব ধর্ম্মপ্রচারকের মত তিনি নিজেকে কখনো জাহির করেন নি।

সে যুগে চীনে 'লাও' ছিলেন আর একজন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক। কনফুসিয়স তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। লাও সে সমাজের অত্যাচার অনাচার দূর করার জন্যে অতীতের মত সরল জীবন যাপন করতে বলতেন সবাইকে।

কনফুসিয়াস বা 'লাও সের' সময়ে চীনে চলছিল সামন্তবাদী যুগ। সমাজে ছিল ঘোর অশান্তি। কনফুসিয়াসের নীতি ছিল বড়দেরই পক্ষে। চীনের সামন্তবাদের সবচেয়ে বড় পোষক ছিলেন তিনি। কোন নতুন ব্যবস্থা তিনি মানতে চাইতেন না। বড় ছোটর যে ভেদাভেদ সমাজে চলত তাই কায়েম রাখবার চেষ্টা তাঁর ছিল। সে জন্যেই অনেক রাজা রাজরারা শীগ্‌গীরই তাঁর শিষ্য হ'য়ে পড়েছিলেন। ভবিষ্যতে ছেলে কি নাতির কি হবে

সে দিকে লক্ষ্য রাখার কথা তিনি বলতেন না। শুধু পূর্ব্বপুরুষের পূজাই ছিল সার।

মো-তি জন্মেছিলেন ৫৭৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে। কনফুসিয়াসের একই সময়ে জন্মিলেও তিনি কনফুসিয়াসের মতের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি দেখলেন যে চীনের সামন্ত সমাজে গরীবরা বড় লোকদের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছে। গরীবদের ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে তিনি চাননি। সেজন্যে তখনকার যুদ্ধ বিগ্রহ ও সমস্তরই বিপক্ষে ছিলেন তিনি। তাঁর মত ছিল যে মানুষের দরকারের জন্যই হয়েছে সমাজ। কাজেই দরকার হ'লেই সমাজও বদলাবে। কনফুসিয়াস তা বলতেন না। তিনি বলতেন যে সমাজ যেমন আছে তেমনি থাকবে। গরীবদের উচিৎ কষ্ট সহ্য করা। যে এজন্মে যত কষ্ট করবে পরজন্মে তার তত সুখ। মো-তি আর কনফুসিয়াসের মধ্যে তোমরা কার মত পছন্দ করবে ?

চৌ রাজবংশের অধীনে চীনের চারদিকে ছড়ানো টুক্‌রো টুক্‌রো কুল জড়ো হ'য়ে এক রাষ্ট্রের অধীনে আসে। দেশ শাসন করা আরও সহজ হয়। চীনের সব কিছুই চলে ঢিমে তালে। সব রাজবংশই দেখবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে। সময় যেন অফুরন্ত। চৌ রাজবংশও প্রায় হাজার বছর রাজত্ব করেছিল চীনে। তাদের শেষের যুগে রাজত্বের অনেক অবনতি ঘটে। ছোট ছোট অঞ্চলের রাজারা মাথা তুলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

অকর্ম্মণ্য চৌ রাজবংশের শেষ সম্রাটকে 'চীন' বংশের একজন সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দেয়। এঁরই বংশধরদের নিয়ে তৈরী হয় 'চীন' বংশ। আর 'চীনের' নামও হয় এদের বংশের নাম থেকেই।

আমাদের দেশেও এক কাহিনী আছে যে মহারাজ ভরতের নামানুসারে এদেশের নাম হয়েছে 'ভারতবর্ষ'!

চীন রাজবংশের গোড়াপত্তন হয় খ্রীঃ পূঃ ২৫৫ সালে। তার তেরো বছর আগে সম্রাট অশোক হয়েছেন ভারতের ভাগ্য বিধাতা। চীন বংশের প্রথম তিনজন খুব অল্পকাল রাজত্ব করেছিলেন। চতুর্থ রাজা ছিলেন ওয়াং চেং। তিনি

গদীতে বসেই নিজের নতুন নাম নেন 'শী হুয়াং তি'—বা প্রথম সম্রাট। নিজের সম্পর্কে তাঁর খুব উঁচু ধারণা ছিল। তাই তিনি প্রচার করেন যে তাঁর রাজত্ব থেকেই চীনের ইতিহাস শুরু। অতীতের গৌরব তিনি সব ভুলে যেতে বলেন সবাইকে। শুধু রাজারাজড়া নয়, দেশের অতীত ইতিহাসও ভুলিয়ে দিতে চাইলেন তিনি। হুকুম জারী হ'য়ে গেল যে দেশের যেখানে যত ইতিহাসের বই বা অতীতের মহাত্মাদের জীবন চরিত আছে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তাঁর এক শিলালিপিতে আছে "যারা অতীতের উদাহরণ দিয়ে বর্ত্তমানযুগের কাজের প্রতি উপেক্ষা করবে আত্মীয় স্বজন শুদ্ধ তাদের সবাইকে খুন করা হবে।" কি ভীষণ হুকুম, তাই না? শুনেই তো গায়ের রক্ত জল হ'য়ে যায়। কিন্তু সম্রাট অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন করিয়েছিলেন। শত শত জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের জীয়ন্তে কবর দেওয়া হয়েছিল।

এত অত্যাচারের ফল যা হবার তাই হ'ল। চীনের ইতিহাসে 'চীন'রাই সবচেয়ে অল্পদিনের জন্য রাজত্ব করেছিলেন। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তাঁদের সব শেষ হয়ে যায়।

তাঁর একটি অক্ষয় কীর্ত্তি এখনো আছে। সেটি হচ্ছে চীনের প্রাচীর। তিনিই প্রাচীর গড়া শুরু করেছিলেন।

'চীন' বংশের পর 'হান' বংশ চারশো বছর ধরে চীন শাসন করেছিল। এ বংশের ষষ্ঠ সম্রাট উ-তী-ও ছিলেন খুব বিখ্যাত। তাঁর যুগে পূর্ব্বে কোরিয়া থেকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত ছিল চীন সাম্রাজ্য বিস্তৃত। রোমের সাম্রাজ্যের কত গল্পই না তোমরা শুনে থাকবে। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক বিস্তৃত আর শক্তিশালী ছিল চীনের সাম্রাজ্য! তাঁর আমলেই পৃথিবীর এই দুটি বৃহত্তম রাজ্যের পরিচয় হয়েছিল। দু দেশের মধ্যে ব্যবসা বানিজ্যও চলত।

হান রাজত্বের সময় বৌদ্ধ প্রভাব চীনে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলা চীন, সেখান থেকে কোরিয়া ও জাপানে প্রসার লাভ করে। হান রাজত্বের আর একটি বিরাট দান হচ্ছে 'মুদ্রাযন্ত্র' বা ছাপাখানা।

চীনেই প্রথম ছাপার যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছিল। তবে ইওরোপে আরও ৫০০ বছর পরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র কার্য্যকরী ভাবে চলতে আরম্ভ করেছিল। রাজশাসনের জন্য যে সব কর্মচারীদের নিয়োগ করা হ'ত, তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে, পরীক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্তও চীনেই এই যুগে প্রথম প্রচলিত হয়। তাই আজ তোমরা এদেশে আই, সি, এস; বি, সি, এস; আই, জি—কত প্রতিযোগীতা-মূলক পরীক্ষার নাম শুনতে পাচ্ছো।

হান বংশের পরে কিছুকাল চীনের ইতিহাসে আবার আগের মত খণ্ড খণ্ড রাজত্ব দেখা দেয়। তিনটি প্রধান রাজত্বে চীন বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। খ্রীষ্টের জন্মের দুই শতাব্দী পরে হান বংশ উচ্ছেদ হয়েছিল এবং তখন থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত চীনের ইতিহাস গোলমালের মধ্যে দিয়ে কেটে যায়।

বাইরে থেকে তাতার আক্রমণের শেষ ছিল না। কিন্তু তবু চীন একান্ত নির্জ্জনে শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের আরাধনা বন্ধ করেনি কখনো। ভারতের সূক্ষ্ম তাঁতের কাপড় চীনে রপ্তানী হ'ত। তাছাড়া ধর্ম্ম, দর্শন এই সব বিষয়ে ভারতই ছিল চীনের শিক্ষক।

ভারত থেকে ক্রমাগত বৌদ্ধ দার্শনিকরা চীনে গিয়ে ধর্ম্মপ্রচার করতেন। তাঁদের সঙ্গে ভারতের শিল্পকলার প্রভাব চীনে ছড়িয়ে পড়েছিল। চীন থেকেও লোকজন হরদম ভারতে আসত। এদের শুদ্ধ ভাষায় 'পরিব্রাজক' বলে। চীন পরিব্রাজক হিউয়েং সাং ও ফা' হিয়েন-এর নাম অনেকে শুনে থাকবে।

ভারতে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কমছিল তখন বৌদ্ধদের প্রধান ধর্ম্মগুরু বোধিধর্ম্ম দক্ষিণভারত থেকে চীনে চলে যান। ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৃদ্ধ বয়সে চীনের ক্যান্টন প্রদেশে উপস্থিত হন। চীনের তখন কোন কোন প্রদেশে তিন চার হাজার ভারতীয় ভিক্ষু ও প্রায় দশ হাজার পরিবার বাস করত। তখন থেকে চীনই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায়।

এর পরে টাং রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে। সম্রাট 'কাও জু' ৬১৮ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত চীন এক করে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্বে কাম্বোজ, আসাম ও পশ্চিমে পারস্য পর্য্যন্ত সব দেশ তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে আনেন।

টাং সম্রাটরা দেশ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিব্রাজক বিনিময়—এসমস্ত কাজে খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁদের উৎসাহে বাইরের বহু বিদেশী চীনে বসবাস করত। তেমনি করে একদল আরবী ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারের বহু আগে থেকেই চলে আসে দক্ষিণচীনে।

আমাদের দেশে এখন লোক গণনা হয়। দশ বছর পর পর ভারতে লোক গণনা হয়। ইংরাজীতে লোক গণনাকে বলা হয় 'সেনসাস' (Census)। লোক গণনার ব্যবস্থাও প্রথম প্রচলিত হয় চীনে। তখন তারা গুণত শুধু দেশে কত পরিবার আছে তাই। এক এক পরিবারে পাঁচজন করে লোক ধরা হ'ত। সেই ভাবে ১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনের লোকসংখ্যা হয় ৫ কোটি। লোক গণনার কৃতিত্বও আগের হান রাজবংশের প্রাপ্য।

টাং রাজবংশের আমলেই চীনে প্রথম খ্রীষ্টান ও ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ হয়। আরবী মুসলমানরা চীনের লোকের কাছ থেকে প্রথমে ৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে কাগজ তৈরী শেখে। সেই বিদ্যা আবার ইওরোপের অন্য সব জাতি আরবীদের কাছে শিখেছিল। বারুদও আবিষ্কার হয়েছিল চীনে এই যুগে। ইওরোপের চেয়ে সব বিষয়ে তখন চীনের সভ্যতা উঁচু স্তরের। চীনের ইঞ্জিনীয়ারদের সমান কেউ ছিল না ইওরোপে।

টাং যুগে চীনের উন্নতি হয় সব দিকে। ভারতে তখন গুপ্তযুগ শেষ হয়েছে। চীন ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে জ্ঞান বিজ্ঞানে। তবে টাং যুগের শেষে দেশের শাসনকর্ত্তারা বিলাসপ্রিয় হ'য়ে পড়ায় গরীবদের খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আরও নানা ভাবে তাদের শোষণ করা হ'ত। তাতে তারা বিদ্রোহ করে টাং বংশ উচ্ছেদ করে দেয়।

৯৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে কাও শু (Kao-su) চীনে শুং বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। টাং বংশ গরীব চাষীদের জমীজমার খাজনা না কমানোর জন্যে দেশের লোক ক্ষেপে গিয়েছিল। কাও শু তাই প্রথমেই তাদের জমীজমার খাজনা কমিয়ে দেন। খাজনার জন্যে নগদ টাকা না দিয়ে প্রজারা শস্য দিতে পারত রাজভাণ্ডারে। ধনীদের উপরে তিনি 'আয়কর' বসিয়ে দেন। যার যেমন

[illegible]দার, তাকে তেমন খাজনা দিতে হ'ত। চাষীদের যাতে সাহায্য হয় [illegible] তিনি দরকার হ'লে রাজকোষ থেকে তাদের টাকা ধার দিতেন। চাষীরা আবার ফসল উঠলে সে টাকা শোধ দিত। দেশে যখন শস্তের দর কমে যেত তখন রাষ্ট্র থেকে শস্ত কিনে নিয়ে চাষীদের সাহায্য করা হ'ত। হয়তো গত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে তোমরা বাংলাতেও দেখেছো যে সরকার সব চাল ডাল কিনে নিয়ে সস্তায় লোকজনকে বিক্রী করত সে সব জিনিস। আমাদের কত আগে, প্রায় এক হাজার বছর হবে তাহলে দেখ চীনের চাষীরা তাদের দাবী আদায় করে'ছিল।

আগের যুগের মত লোকজনকে দিয়ে বেগার খাটানো বন্ধ করা হয়। কাজ করলেই তারজন্যে মজুরী দিতে হ'ত তখন। দেশে শান্তি স্থাপনের জন্যে শান্তি সেনা গড়ে তোলা হয়েছিল। চীনা ভাষায় তাকে বলা হয় 'পাও চিয়া' (Pao Chia)। প্রায় ৩০০ বছর ধরে শুং বংশ চীনে রাজত্ব করেছিল। কিন্তু শেষ রাজারা গরীবদের সুখ সুবিধা না দেখায় দেশে অসন্তোষ বেড়ে ওঠে ও বাইরের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারায় শুং বংশের পতন ঘটে।

মধ্য এশিয়ায় যাযাবররা বারংবার ব্যর্থ মনোরথ হবার পর অবশেষে চীন দখল করে নেয়।

এবার চলে এস অতীতকে পিছনে ফেলে আধুনিক যুগে।

বাষ্পীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে ইংরাজরা অন্য সব জাতির চেয়ে অনেক এগিয়ে গেল। দিকে দিকে তাদের বিজয় পাতাকা উড়ছিল। চীনও বাদ গেল না।

চীনে এসে ইংরাজরা যথারীতি শোষণ কাজ চালায়। ভারতবর্ষে যেমন করে ইংরাজরা নিজেদের দখলে এনেছিল চীনে কিন্তু তা করে নি। চীনের সঙ্গে তারা চাইল শুধু ব্যবসা করতে। চীনের মাটীতে আফিং এর চাষ হয় খুব ভাল। ইংরাজদের হাতে সে ব্যবসা খুব ফেঁপে ওঠে। দেখতে দেখতে সমস্ত চীনের লোককে করা হ'ল আফিং খোর।

চীন সরকার আফিঙের-ব্যবসা বন্ধ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইংরাজরা গায়ের জোরে চীনে লুকিয়ে লুকিয়ে আফিঙ্ চালান দিত। এ নিয়ে চীনের সঙ্গে ইংরাজদের অনেক যুদ্ধও হয়। হেরে গিয়ে অপমানকর সন্ধি মানতে হয় চীনকে।

ইংরাজদের দেখাদেখি ফ্রান্স, জার্ম্মানী, জাপান সবাই চীনকে দুর্ব্বল পেয়ে শোষণ করতে থাকে।

অপমানের ফলে চীনের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা আসে। তারা বুঝতে পারে যে অতীতের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা না বদলাতে পারলে চীনের কখনই ভাল হ'তে পারে না। তখন ডাঃ সান ইয়াট সেনের নেতৃত্বে চীনের তরুণদের অভিযান আরম্ভ হয়।

১৯১১ সালে ডাঃ সানের নেতৃত্বে চীনের জাতীয় দল স্থাপিত হয়। তার নাম কুয়োমিনটাং। তিনি নিজে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন বলে ডাঃ সান আগের রাজবংশ ধ্বংস করে সেখানে গরীবদের যাতে ভাল হয় এমন রাষ্ট্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নেতৃত্বে চীনের প্রথম বিপ্লব সফল হয়। চীনের শেষ রাজবংশ মাঞ্চুদের পতন ঘটে।

এতদিনে মনে হ'ল চীনের সুদিন এনেছে। কিন্তু স্বাধীনতা এত সহজ জিনিস নয়। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকে সজাগ থেকে নিজেদের দাবী আগলাতে হয়। তা না হ'লে কখনই দেশ স্বাধীন থাকতে পারে না। চীনেও তাই হ'ল। একজন বিপ্লববিরোধীদের নেতা চীনের গণতন্ত্র ধ্বংস করে দিল।

তাঁর প্রথম কাজই হয় জাতীয় দল কুয়োমিনটাং ভেঙে দেওয়া। ডাঃ সান দক্ষিণ চীনে পালিয়ে এসে ক্যাণ্টন শহরে নতুন করে গণতন্ত্রী শাসন স্থাপন করেন।

ইওরোপের মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। রাশিয়ায় চাষী মজুরের রাষ্ট্র সোভিয়েট মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ডাঃ সান সেই গরীবদের রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চাইলেন। চীনের তখন অবস্থা খুব খারাপ। দেশে কিছু তৈরী হ'ত না। বিদেশীরা সমস্ত ব্যবসা দখল করেছিল। সোভিয়েটের সঙ্গে চীন আবার সভ্য সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইল।

সোভিয়েটের আদর্শে চীনের জাতীয়দলের মধ্যেই কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী দল গড়ে ওঠে। সাম্যবাদীরা চায় দেশের গরীবদের রাজত্ব। গরীবরাই দেশের বেশীর ভাগ লোক। তাদের যাতে সুবিধা হয় তা দেখাই হ'ল সকলের উচিত।

ডাঃ সানের অধীনে সোভিয়েটের সাহায্যে দক্ষিণ চীনে জাতীয় দলের রাজত্ব খুব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই দুর্দ্দিনেই ডাঃ সানের মৃত্যু হয়।

তাঁর শিষ্য ছিলেন সেনাপতি চিয়াংকাইশেক। তিনি জাতীয় দলের নেতা হ'লেন। কিন্তু চিয়াং প্রকৃতপক্ষে চীনের গরীবদের স্বার্থ না দেখে বড়-লোকদের দলে চলে যান। তখন জাতীয় দল দুভাগে ভাগ হ'য়ে যায়। চিয়াং উত্তর চীনের সবটা দখল করে চীনকে শক্তিশালী করবার চেষ্টা করেন। আর অন্যদল সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে দক্ষিণ চীনেই চাষী মজুরদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী, ইংরাজ, জাপান, এদের প্ররোচনায় চিয়াং সাম্য-বাদীদের দমন করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় না। সাম্য-বাদীরা জাতীয়দলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে চায়।

চীনে যখন চিয়াং ও সাম্যবাদীদের মিলনের সম্ভাবনা হ'ল তার আগেই জাপান ভয় পেয়ে চীন আক্রমণ করে বসে। ১৯৩১ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত চীন জাপানের সঙ্গে লড়াই করছে। তোমরা বড় হ'য়ে দেখো কি বীরত্বের সঙ্গে চীনের লোক স্বদেশের স্বাধীনতার শত্রু জাপানকে বাধা দিয়েছে।

সে স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতও অংশ নিয়েছিল। কি করে জানো? ভারতের জাতীয় কংগ্রেস চীনের লোকদের সাহায্যের জন্য একটি ডাক্তারী দল পাঠিয়েছিল চীনে। তার নেতা ছিলেন ডাক্তার অটল। আমাদের বাঙালী একজন ছিলেন সেই দলে। তাঁর নাম ডাঃ বিজয় বসু!

সাম্যবাদীদের নেতা হ'লেন মাও-সে তুং। তাঁরই নেতৃত্বে সাম্যবাদী চীন গরীবদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে।